বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বাংলার যাবতীয়
স্কুলের জন্য প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত
[কলিকাতা গেজেট, ৩রা মে, ১৯৫১ সন]

কি করা যাবে?

প্রথম খণ্ড

ডাঃ ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

চুঁচুড়া

প্রকাশক
শ্রীবিজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
[illegible] লেন, চুঁচুড়া

[illegible] প্রেস হইতে
শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত
আনন্দ [illegible],
[illegible] ঘাট, চুঁচুড়া

পূজ্যপাদ

৺পিতৃদেবের

শ্রীচরণে

উৎসর্গ করিলাম

বিনীত কন্যা

অগ্রহায়ণ,
১৩৫৭।

সূচীপত্র

সময় সম্বন্ধে	
বৃত্তি সম্বন্ধে	১৯—৮০
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে	৮১—১০৭
উৎসাহ সম্বন্ধে	১০৮—১৫২
পরিশিষ্ট	১৫৩—১৬০

কি করা যাবে ?

সময় সম্বন্ধে

এক

সম্বল মানেই পুঁজিপাটা ; নয় কি ? তা সেটা যত অল্পই হোক। আমরা প্রত্যেকে জন্মেছি ; এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছি নেংটা বটে ; তবুও একটা সম্বল নিয়ে। অল্প হলেও সেটা তাচ্ছিল্য করবার মতন কিছু নয়। সেটা খুব দামী জিনিস, এমন কি আমাদের সারা জীবনের মূলধন। আর সেই পুঁজিটুকু, যেটুকু মাত্র সম্বল করে আমরা জন্মেছি, তারই নাম হচ্ছে— সময়।

পুঁজি খুব অল্প বলেই হয়তো আমরা সেটাকে হেলাফেলা করি, সব চেয়ে বেশী অযত্ন করি। কিন্তু এটা অন্যায় করি না কি ? যখন আমরা বুঝি, সেটার খুব অল্পই আমরা পেয়েছি, তখন সেটাকে যা তা করে নষ্ট করতে দেখলে বিস্ময়ে অবাক হ'তে হয় নাকি ? কই, ঘনিষ্ঠতার বেলায় তো আমরা বেশ মুখচোরা, কৃতজ্ঞতার বেলায় তো বেশ সাবধানী, ধন, দৌলতের বেলায় তো বেশ কঞ্জুস, তবে সময়ের বেলায় এত মুক্তহস্ত কেন ? এর বেলায় আমাদের সে সতর্কতা কোথায় ? কেন, সময় কি কিছু অপরাধ করেছে ? অপরাধ যদি নাই করে থাকে তো এর হিসাব-নিকাশ নেই কেন ?

কি করা যাবে

আমরা কি নিজেদের একটিবার প্রশ্ন করেছি, কতক্ষণ শোব, কতটুকু জিরোব, কতক্ষণই বা কুঁড়েমিতে কাটাব, কতটুকুই বা দরকারী কাজে, হিতকর চিন্তায় লাগাব, আর চাই কি এর কতক্ষণই বা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় করব? করবো কি করে? এ করতে গেলেই তো নিজেরা ধরা পড়ে যাব; সেই হিসাব-নিকাশের ফাঁদে পা দেওয়াই তো হবে। জমা খরচ মিলবে কি? পরিণামে প্রত্যক্ষ করতে হবে খরচের খাতে কেবল বিশৃঙ্খলা আর তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে কলঙ্ক তাই।

নীতিজ্ঞের বস্তাপচা পুরাণ বক্তৃতা থেকে আরম্ভ করে কবির কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা অহরহ শুনে আসছি, জীবনটা ক্ষণস্থায়ী, সেটা একটা বুদবুদের মতন। কেউবা, বলছেন সেটা কিছুই নয়, একটা প্রহেলিকা মাত্র, আবার কেউবা বলছেন ভোরের কুয়াসা আর জীবন দুইই এক, কোনও পার্থক্য নেই। এদিকে কবি তো গেয়েই রেখেছেন, 'এ জীবন নিশার স্বপন'। কিন্তু এত করেও তো আমাদের সেই ভুল ভাঙ্গছে না, আমরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি, যে যাই বলুক ওর আর ক্ষয় ব্যয় নেই —ওটা অনন্ত।

কিন্তু এই ধারণাটা আমাদের হ'ল কি করে? রীতিমত আশ্চর্য্য হতে হয় না কি, যখন আমরা দেখতে পাই যে, ওই সব মনিষীদের যুগ, যুগান্তরের সাধনা-লব্ধ অভিজ্ঞতা আজ আর আমাদের কোন কাজে আসছে না? অমন মহামূল্য জিনিস পেয়েও আমাদের কৌতূহল-চঞ্চল মন তবুও তার সংকীর্ণ ধারণার গণ্ডি ভেদ করে সেটাকে কাজে লাগাতে পারছে না?

কি করা যাবে

গচ্ছিত সম্পত্তির ভার পেয়েও সেটার সুব্যবস্থা হচ্ছে না কেন ? পুঁজি বলে দুর্ণামের ভয়ে কি ? না, সত্যিই এর পিছনে কোন যুক্তি আছে ? স্বীকার করতেই হবে যে, বলার মত কোন যুক্তিই নেই। নিছক সুবিবেচনা এবং কর্তব্যবুদ্ধির অভাবেই এমনটা হচ্ছে আর এই দুটোর মধ্যে এমনই নিবিড় মাখামাখি যে, হয়তো এই দু'টোকেই সময়ের অবহেলার দরুণ দায়ী করা চলে। সুতরাং এগুলোকে আস্তে আস্তে দূর করতেই হবে। কিন্তু এটা বিশ্বাস করাই শক্ত যে, যারাই সময় নষ্ট করে, তারাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য আর তারাই মরিয়া বা বেপরোয়া। এই একগুঁয়েমি, এই অবাধ্য মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে কি ভাবে সংক্রামিত হয়েছে সেইটাই দেখা যাক।

যখনকার যা' তখনকার তা' এই কথাকটা বলে খালাস হওয়ার মত ভুলের দরুণই আজ আমাদের এই অবস্থা। অবশ্য আমরা স্বীকার করছি, আমরা আহাম্মক, ফাঁকি দেওয়াটাই আমাদের ধর্ম্ম; আমরা মনের স্বাস্থ্য হারিয়েছি, উচ্চ সঙ্কল্প বা উন্নত অভিপ্রায়ের ধার আমরা ধারি না ; কিন্তু এর জন্য দায়ী কে ? কেউ কি আমাদের শিখিয়েছে, কেমন করে সময়ের কদর করতে হয়, কি করে তা নিয়ে কারবার করতে হয় ? যেহেতু আমাদের অভিভাবকেরা এই আসল সম্পদ নিয়ে তেজারতি করতে শেখাননি, আমরাও তাই শিখিনি। আমরা শিখেছি সভ্যভব্য হতে, স্কুল, কলেজে যেতে, পরীক্ষা দিতে আর নিতে।

কি করা যাবে

সময়কে কি করে ব্যবহার করতে হয় বা তার গৃহস্থালী সম্বন্ধে কোন দিনই আমাদের টনক নড়েনি, তাই আমরা জানি না একটা মুহূর্ত্ত কাকে বলে! কি তার মূল্য! কথায় বলে, রাই কুড়িয়ে বেল। আমাদের দিনের খবরদারি করতে হবে না, করতে হবে প্রতিটী পলের। দিন সে চলে যাবে, কোনও কিছু গ্রাহ্য করবে না। তার নিজের তত্বাবধান কি করে করতে হয়, তা সে নিজে বেশ ভালই জানে।

জানি না শুধু আমরা। আমাদের ঘরে বাইরে সমান। জ্ঞান উন্মেষ থেকে স্বরু করে আমরণ সময়টাকে ফাঁকি দেওয়াটাই যেন আমাদের ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোজকার কাজ অর্থাৎ দিনচর্যা, তাও আমরা সময় নির্দ্দিষ্ট করে করি না। এজন্য যে কেবল কর্ত্তারা দায়ী তা নয়, দায়ী আমরাও।

প্রতিদিন নিয়ম করে পড়াশুনা তৈরী পাছে করতে হয়, তাই আমরা বলি, পরীক্ষার সময় পড়া যাবে, এখন কি? খাওয়ারও একটা নির্দিষ্ট সময় নেই। হয়তো খাবার দিয়ে ডাকাডাকি করছে, আমাদের পাত্তা নেই, আমরা উপর নীচে করছি। নয়তো খেতে বসে যে গল্প লাগিয়েছি, তাতে করে কেবল সময়ের শ্রাদ্ধ শান্তিটুকু করতে বাকী রেখেছি। এমনি করে খানিকক্ষণ বৈঠকখানায়, খানিকক্ষণ শোবার ঘরে, সকাল সন্ধ্যায় ক্রমাগত সময় নষ্ট হয়েই চলেছে। তারপর ব্যাপার গুরুতর! এটা হয়নি! ওটা বাকা রয়ে গেছে! আচ্ছা, ভুল হয়ে গেছে! ভয় কি! কাল করা যাবে।

কি করা যাবে

সত্যি বলতে কি, এই কাল ধরনের ভুল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উপযুক্ত উপকরণ, আমাদের দেশে, ভারতের কোন সমাজের আছে কিনা সন্দেহ। ও অন্যায়ের কাছে মানুষের শপথ, মানত, কত রকম কিছু সব একে একে বলি পড়েছে, পড়ছে এবং পড়বে তবুও সে "কাল" আর আসবে না। যা আসবে, সেটা [illegible] "আজ"। "কাল" যে চলে গেছে, ডাকলে [illegible] করার শক্তি তার নেই। সে [illegible] সমাধিস্থ। তাই তার জন্যে দুফোঁটা চোখের জল ফেলা ছাড়া আর আমাদের করণীয় কিছু নেই। আমাদের চাইতে হবে 'আজকের' দিকে।

'কালকের' জন্য কষ্ট হচ্ছে বললে কি হবে? তার জন্য বিলাপ করে আমরা তো আজকের দিনটাকে নষ্ট করতে পারি না। দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সেই দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আজকের দিনটার সদ্ব্যবহার করে—হাহুতাশে নষ্ট করে নয়! মানুষের মধ্যে তারাই বড় হয়, ভাল হয়, যারা তাদের সময়টাকে ব্যবহার করতে জানে। [illegible] প্রতিভাশালীর প্রতিভাও ফুটতে পারে না যদি সে অবকাশ হারায়, আর সুযোগ সুবিধাও বেহিসাবীর হাতে ধরা দেয় না, এমনি তার রীতি। তাই অন্য সব কিছু ফেলে রেখে সর্বাগ্রে আমাদের চিনতে হবে সময়কে। তারই মিতব্যয়িতা শিখতে হবে এবং সেটাকে উপকারে লাগাতে হবে। মনীষা, সম্পত্তি, ওসবের এখন কোনও প্রয়োজন নেই, ওর জন্য আমাদের বিব্রত হতে হবে না।

কি করা যাবে

উপস্থিত মনে প্রাণে জানতে হবে সময়ই আমাদের সম্পত্তি এবং সেটারই আবাদ করে সোনা ফলাতে হবে। এটা হারাণোর দরুণ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় কোন ফল হবে না। এ অনুসন্ধানের বাইরে। রাম-রাজত্ব যেমন খুঁজলে আর মেলে না, বৃদ্ধের যৌবন যেমন গেলে আর ফেরে না, এও তেমনি একবার হারালে আর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। ধ্বংসাবশেষের উপর নূতন কিছু গড়া চলে, কিন্তু পুরাণোকে সেখানে আর প্রতিষ্ঠা করা চলে না। কিন্তু আমরা এটা স্বীকার করতে রাজী নই বলেই দোহাই দিই সময়ের অভাবের। আমাদের বিশ্বাস, সময়ের অভাবে আমরা ওদিকে নজর দিতে পারিনি বলেই ওটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, নইলে হ'ত না।

কথাটা যে একেবারে মিথ্যা একেবারে অসার তাও নয়। অনেককে বলতে শুনেছি সময় পেলে তিনিও, গান্ধীজী অপেক্ষা আরও বড় লোকহিতৈষী হতে পারতেন; দরিদ্র নারায়ণের সেবা করতে পারতেন, নিরাশ্রয়া বিধবাদের আশ্রয় দিতে পারতেন, অস্পৃশ্যদেরও বাপুজী হতে পারতেন—পারেননি শুধু সময়ের অভাবে। তাঁদের বক্তব্যের ভিত্তি যে যথার্থ সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত—এ আমাদের স্বীকার করতেই হবে। বাস্তবিকই তাঁদের প্রতি কথায় মনে না হয়ে পারে না যে, তাঁরা অপরিহার্য্য কাজে ডুবে আছেন, তাঁদের সত্যই সময়ের অভাব, সেটার অপ-প্রয়োগের দরুণ কিছু তাঁরা বাতিল হয়ে যাননি।

কি করা যাবে

তাই ভালো করে দেখলে দেখা যায় যে, ব্যবস্থাই সময়ের সৃষ্টিকর্তা। কথায় আছে, "দিবসে ঘুমায়ে রাতে যে জাগে, সে জনা কখনও কাজে না লাগে"। আরও পরিষ্কার করে বললে বলা চলে যে. সময়ের প্রয়োজন সব কিছুতেই এবং সব কিছুই সময়সাপেক্ষ। দরকারী কাগজ-পত্র খোঁজার তাড়াতে এলো-মেলো ভাবে সব কিছু কাগজ-পত্র ঘুলিয়ে ফেললে যেমন একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, ঘণ্টাগুলোকে নিয়ে তেমনই আনাড়ির মত তাল পাকিয়ে ফেললে সময়টাকে নিয়ে লণ্ডভণ্ড করা ছাড়া আর কি হতে পারে?

সেটাকে সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হলে ঘণ্টাগুলোকে ঠিক ঠিক ভাগ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে না কি? অবশ্য তাই বলে আমি এ কথা বলছি না যে, সময়টাকে দিয়ে আমাদের পিছমোড়া করে বাঁধতে হবে, তা নয়। সময় আমাদের চাকরই থাকবে, আমরা সময়ের ক্রীতদাস হতে যাব না। তবু তার মধ্যেই আমাদের কতকগুলো বাঁধাধরা নিয়মের ভেতর দিয়ে চলতে হবে, যা আমরা অকারণে লঙ্ঘন করতে পারব না।

প্রশ্ন হতে পারে; আমাদের সকলের পক্ষে কি একই নিয়মে কাজ করা সম্ভব? কেউ একদিনে যা করবে আমাদের সেটা করতে হয়তো এক সপ্তাহ লাগতে পারে। সে হয়তো বুদ্ধিমান! আমরা হয়তো তার চেয়ে বোকা! তার শক্তি আছে, আমাদের নেই! এটা কোন কাজের কথাই নয়।

কি করা যাবে

আসল কথা, সে সময়টাকে ভাল ভাবে খাটাতে পারে বলেই অত শীঘ্র কাজটাকে শেষ করে। তাই সফলকাম যারা, তাদের অবসরও নেই। বিশ্রাম কি তারা তা জানে না, সে কথা মনে পড়ে না। ওটা শোনা যায় কেবল কুঁড়ের মুখে। কর্মীর যেমন প্রতি ঘণ্টার প্রতিটী কাজ আছে; নিষ্কর্মারও তেমনি দিন কাটাবার মত প্রচুর খোস-গল্প, আমোদ-আহ্লাদ, ভরসা, ভাবনা আর আপশোষের গাদা হয়ে আছে। তার আবার এত বেশী অবসর যে, সে কাজ করার সময়ই খুঁজে পায় না।

তাহ'লে কি অবসর জিনিসটা এতই বিরাট? হাঁ, ঠিক তাই! সেটাকে খুব সাবধানে এবং সতর্কতার সঙ্গে সংযত বা পরিমিত না করলে সেটা তার সীমা ছাড়িয়ে আমাদের গোটা মানুষটাকেই গ্রাস করে ফেলবে। আমাদের পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেব আমাদের সব সময়েই বলতেন যে, "যারাই হতভাগা তারাই বিশ্রাম চায়"। সেই স্বনামধন্য কৃতী মহাপুরুষ আজ ইহজগত ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর এই কথাটা রূঢ় হলেও শাশ্বত সত্য হয়ে আছে এবং চিরদিনই থাকবে। তিনি ছিলেন কাজের লোক, তাই অবসরের চিন্তাও তাঁকে অসুখী করত। বাস্তবিক সময়টা মূল্যবান যে মনে করে, তার তো অবসর থাকতে পারে না। তাই তাঁরও ছিল না। শুনেছি, আধপয়সায় গঙ্গা পারাপার হওয়ার জন্য তাঁকে খেয়াঘাটে অপেক্ষা করতে হ'ত আধঘণ্টা, আর এই আধঘণ্টার জন্য পড়তে পাওয়ার দরুণ তিনি বি, এল, পাশ করে কালে জজ হয়েছিলেন।

কি করা যাবে

প্রত্যেক উদ্যমশীল লোকই এমনি ভাবে সময়টাকে কুড়িয়ে নিয়ে চলেন আর তাই জগতটা বেশীর ভাগ তাঁদের কাছে ঋণী থেকে যায়। গরিবের ঘরে জন্মে বাঙ্গালীর যেই বরেণ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রও আট বছর বয়সে হাঁটাপথে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় আসতে আসতে মাইলষ্টোন দেখে ইংরেজী অঙ্ক ঐটুকু সময়ের মধ্যেই শিখে ফেলেছিলেন। আবার আর এক সময়ে স্কুল পরিদর্শনে যেতে পথে পালকির মধ্যেই কয়েক ঘণ্টার ভিতর "উপক্রমণিকা" লিখে ফেলেন, পাছে সময় নষ্ট করতে হয়। এই রকম লোকের ভেতর থেকেই চিন্তাশীল নেতা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকের দর্শন মেলে যুগে যুগে। আমাদের নেতাজী সুভাষও, সেই সুভাষ যিনি আফগনিস্তানের দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপথ অতিক্রম করতে করতে মানসপটে কল্পনার তুলি দিয়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের রঙিন্ ছবি এঁকেছিলেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের সেই তেজস্বী সৈনিকের কাছে বাড়িতে অন্তরীণ হয়ে নিষ্কর্মার জীবন যাপন করাটাও ছিল অসহ্য।

আর একজন, সারা ভারতবর্ষ যাঁর নাম দিয়েছে, মহাত্মা— সেই গান্ধীজী ঠিক ভোর চারটার সময় রোজ উঠতেন এবং সাধারণত রাত্রি ন'টার সময় শুতে যেতেন। কিন্তু সারাদিন যা খাটতেন সেটা ঘড়ি ধরে। তাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা ঘড়িও থাকতো তাই শোবার আগে সেটা দেখে হিসেব করে মিলিয়ে নিতেন —দিনটা কেমন কেটেছে।

কি করা যাবে

তাঁর প্রত্যেক কাজের মত খাবারের একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল, কোন কারণেই সে সময়ের রদ-বদল হতনা। একবার বড়লাটের সঙ্গে খুবই জরুরী কথা কইছেন এমন সময় খাওয়ার সময় হ'ল, তখন কথাবার্তার মধ্যেই তিনি খাবার খেয়ে নিলেন। জীবনে একদিন এবং সেটাও তাঁর শেষদিন, যে দিন, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ায় তাঁকে শুনতে হয়েছিল— বাপুজী, আজ আপনার দেরি হয়ে গেছে"। আর তারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। গোটা পৃথিবীটা স্তম্ভিত হয়েছিল সেই ছোট্ট মানুষটির ব্যাপার দেখে।

আরও একজন এই ভারতেরই উজ্জ্বল রত্ন, বাঙ্গালীর এবং বাঙ্গলার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত আলস্য যে কি জিনিস তা জানতেন না। ছেলেবেলা থেকে তিনি কেবল ইংরেজী চর্চ্চাই করেছিলেন—অগ্রাহ্য করে কোনদিনও বাংলা ছোঁননি। তখন তিনি মাদ্রাজে—ইংরেজী কাব্য লিখে মস্তকবি বলে নাম ডাক—হঠাৎ ঝোঁক হ'ল মাতৃভাষা বাংলায় বই লিখতে হবে। কিন্তু লিখবেন কেমন করে? সে বড় সহজ ব্যাপার নয়! তবুও সেই ঝোঁক—সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রাণে বল দিলে। তিনি বাংলা ও অন্যান্য ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন। কলেজের চাকরি, কাগজের সম্পাদকতা এবং অন্য সকল কাজ-কর্ম্ম বজায় রেখেও তিনি তার মধ্যে নিজের পড়বার সময় ভাগ করে নিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—শুনলে স্বপ্ন বলে মনে হবে।

কি করা যাবে

৬টা থেকে ৮ টা পর্য্যন্ত হিব্রু পড়া, ৮টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত কলেজের চাকরি, ১২টা থেকে ২টা পর্য্যন্ত গ্রীক, ২টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত তেলেগু ও সংস্কৃত, ৫টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত লাটিন এবং ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্য্যন্ত ইংরেজী, তারপর পত্রিকার কাজ শেষ করে বাংলা পড়া। এমনি করে তিনি নিজেকে মাতৃভাষায় বই লেখার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন, যার ফলে বাঙ্গালী বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা "মেঘনাদ-বধ" মহাকাব্য পেয়ে আজ ধন্য হয়েছে। চার পাঁচ বছর আগে বাংলায় চিঠি লিখতেও যিনি অপারগ ছিলেন এবং 'পৃথিবী' লিখতে গিয়ে 'প্রৃথিবী' লিখতেন, পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি হলেন—মাত্র সময়ের বণ্টনে—এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হতে পারে ?

ছোটখাটো সময়টাকে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাবার জন্য আমাদেরই সেই অসাধারণ প্রতিভাশালী হরিনাথ দে একাধারে একুশটা ভাষায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন, আর অল্পবিস্তর বাইশটা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতে পারতেন। আমাদেরই বর্ত্তমান সরকারের কাণ্ডারী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সুদীর্ঘ চোদ্দ বৎসর জেল খেটেছেন। কিন্তু সে সময়টাও তিনি নষ্ট করেননি। বন্দী অবস্থায় বহু অমূল্য গ্রন্থ লিখে তিনি তাঁর দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন এবং তাঁর 'ডিস্‌কভারী অফ্‌ ইণ্ডিয়া' সেগুলীরই অন্যতম।

কি করা যাবে

সময় সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন সেই ছেলে বাঙ্গালীর গৌরব কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস একদিন আমেরিকার এক স্বাধীন দেশের সেনাপতি হয়েছিলেন, কেবল প্রতিটা সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন বলে।

সামান্য একটু অবসর যা ছেলেমেয়েরা তাস পাশা দাবা খেলে আনন্দ করে কাটায়, সময়ের কঠিন প্রহরী ঈশ্বর চন্দ্র সেটাকেও আলস্যের খেলা বলে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। সময়ের প্রতি তাঁর এমনই নিষ্ঠা ছিল যে, তিনি তাঁর খাবার এবং শোবার সময় থেকে কিছুটা নিঃশব্দে চুরি করে সে সময়টাও পড়াশুনা করতেন। যদিও আমরা এ অভ্যাসের পৃষ্ঠপোষক নই, তবুও স্বীকার করতে বাধা নেই, কাজের সময় থেকে চুরি করে শুয়ে বসে কাটান অপেক্ষা এ চুরি নিশ্চয়ই শ্রেয়। যে কর্তব্যনিষ্ঠ ছোট খোকাটি রোজ সকালে বাজারে গিয়ে জিনিস-পত্র কিনে এনে, কয়লা কুটে, বাটনা বেটে, জল তুলে, ঘর ধুয়ে, কাঠ কেটে, উনুন ধরিয়ে রেঁধে, খেয়ে, তার পর আবার বাসন মেজে সব ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে প্রত্যহ এমন করে সময়কে ভাগ করে নিয়েও, পড়তে বসে ঘুমের হাত এড়াবার জন্য প্রদীপের তেলে নিজের চোখ রগড়ে যাতনায় ছট্‌ফট্ করতে করতে ঘুম তাড়িয়ে, লেখাপড়ায় সকলের উপরে প্রথম স্থান দখল করে চিরদিন বাংলার মাটিকে ধন্য করে গেছে সে কি কখনও সময়ের অপব্যয় বরদাস্ত করতে পারে?

কি করা যাবে

স্বামী বিবেকানন্দ, সব সময়ে বলতেন, "বিশ্রাম, সে তো পরলোকের ব্যাপার—এখানে তার কি" ? প্রত্যেক দেশপূজ্য কর্ম্মী আর ভাবুকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হ'ল এই। বাস্তবিক তাঁরা এমন ভাবেই সময়ের মূল্য বুঝে চলেন যে, তাতে করে এইখানেই তা থেকে যা কিছু সব রসটাই নিংড়ে বার করে নিয়ে, বাকীটা পরকালে পাওয়ার পক্ষে সুসাধ্য করে ছেড়ে দেন। এজন্য এমন কোন কষ্ট তাঁরা সহ্য করতে বাকী রাখেন না, যেটা কেউ টের পায় না। তাই সেই সব মহাপুরুষের বংশধর আমরাও কোন অসাধারণ সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাক্‌ব না, সাধারণ সুবিধেটাকেই আঁকড়ে ধরব মনে প্রাণে।

প্রাণপণে ছুটার চেয়ে ধীরে ধীরে যাওয়া ভাল নয় কি ? আমাদেরও তাই স্যার রাসবিহারীর মতন কোন কাজে একটা হৈ চৈ না করে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হ'বে। বেকার বসে থাকা চলবে না, বৃথা কাজেও লেগে থাকা হবে না, আবার জীবনের বিন্দুমাত্র সময়ও নষ্ট করা চলবে না—এই হবে আমাদের পণ। আমাদের এই পণকে স্যার গুরুদাসের মতন বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত অচল অটল রাখতে হবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে গুরুদাসের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এমনই তীব্র ছিল যে, পুত্রের মুমূর্ষু অবস্থাও তাঁকে কোর্টে যাওয়া থেকে বিরত করতে পারেনি। পুত্র কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে—কখন কি হয় বলা যায় না ; কিন্তু তিনি ঠিক ঘড়ি ধরা আদালতে গিয়ে প্রধান বিচারপতির পাশে বসে বিচার কার্য্য সুরু করে দিলেন।

কি করা যাবে

মুখে তাঁর উৎকণ্ঠার চিহ্নমাত্র নেই—অন্যান্য দিনের ন্যায় ধীর, স্থির। কথাটা যখন প্রধান বিচারপতির কানে গেল তখন তিনিই গুরুদাসকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। পুত্রের তখন শেষ অবস্থা। এমনই ছিল গুরুদাসের কাছে সময়ের মূল্য আর কর্তব্যজ্ঞান।

যাঁরাই বড় হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই যে শৈশব থেকেই সময়ের অবহেলা করেননি এটা ঠিকই। কিন্তু তাই বলে তাঁরা যে কাজের ফাঁকে চিত্তবিনোদনের মৌলিক অধিকারটুকু থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছেন, এমনও নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, স্যার রাসবিহারী যদি কখনও একটু অবসর পেতেন, তা হলে সেই অবসর সময়টুকুও সেক্সপীয়র, মিলটন, পোপ, মেকলে, বার্ক, ফ্রয়েড, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতির বই পড়ে কাটাতেন—আবার কখনও বা তাঁদের রচনা আনন্দে আবৃত্তি করতেন।

মস্তিষ্কের চালনা ক্রমাগত চলতে পারে না, চলা উচিতও নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাদিক্রমে মানসিক শ্রম করার পক্ষপাতী আমরা নই। এমনটা করলে অবসর সময়ের উপর অবিচার করাই হবে, তার সঙ্গে শত্রুতা করা ছাড়া আর কিছুই করা হবে না। অবসরও চাই। আর তার মধ্যে অনেক কিছু শেখারও আছে। ছোট্ট একটা খবর, একটা ঘটনা, একটা হাবভাব, সঙ্গী সাথী নিয়ে একটু মেলা-মেশা, সেও মনের উপর বড় কম দাগ কাটেনা, যদি ঠিক যায়গা মতন ঘা দেয়। এগুলো বেশীর ভাগ অবসর সময়েই ঘটে।

কি করা যাবে

তখন পৌষ মাস। বড়দিনের ছুটি হয়েছে। আশুতোষ, যাঁকে লোকে স্যার আশুতোষ বলেই জানে, ছুটিতে একদিন গ্রীস দেশের কথা পড়ছেন ; বেলা প্রায় তিনটা। তাঁর দু'জন সহপাঠী এসে বললে, "আশু চল খেলিগে ; কি ছুটির সময় পড়ছ" ? আশুতোষ ধীর গম্ভীর উত্তর দিলেন, "ছুটিতে আমি চারটে পর্য্যন্ত পড়াশুনা করে তবে খেলতে যাই। দাঁড়াও, বইটা শেষ করে তোমাদের সঙ্গে যাব। আর এক ঘণ্টা ; বেশী নয়"।

সহপাঠীরা নাছোড়বন্দা। তারা তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করতে লাগল। একজন বললে, "বাকীটা কাল পোড়ো"। আর একজন বললে, "এখন তো চল"। কিন্তু তাদের এ অন্যায় অনুরোধ রাখতে না পেরে আশুতোষ বল্লেন, "না ভাই, আমি তোমাদের সঙ্গে একমত হ'তে পারলুম না ; যে সময়ের যা, সে সময়ে সেটা আমায় করতেই হবে। পরে করব বলে ফেলে রাখতে পারব না, তাতে অনেক অসুবিধা। তার চেয়ে তোমরা যাও, আমার এখন যাওয়া হ'লনা"।

তারা দু'জনেই মনক্ষুন্ন হয়ে চলে গেল বটে, কিন্তু বেশী দূর নয়। কিছুদূর গিয়েই, কি ভেবে ফিরে এসে আশুতোষের পড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চুপ করে বসে রইল। পড়া শেষ হলে আশুতোষ তাদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে খেলাধূলা করে, খুবই মনের আনন্দে বাড়ী ফিরলেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল যে সে দিন থেকে তাঁর সহপাঠীরাও সময়ের কাজ সময়েই করতে লাগলেন।

কি করা যাবে

শেখবার মতন বহু কিছু শিক্ষার জাজ্বল্যমান উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত এইভাবে অনেক সময় আমাদের নজরে পড়ে, যেটা হয়তো খাটা খাটুনির চাপের মধ্যে ধরা দেয় না। যার সুদূরপ্রসারী চোখ আছে, স্বচ্ছ দৃষ্টি আছে—সেই কেবল দেখতে পায়। তা বলে কি যারা ঠিক নিয়মিত ভাবে পড়ে, তারাও জানতে পারবে না ? পারতেও পারে' আবার নাও পারে। রাজপথ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে ছুটে গেলেই কি সব সময়ে গলিঘুঁজির সন্ধান রাখা যায় ? তা যায় না !

তাই আবার বলছি যে, সময়ের সদ্ব্যবহার বলতে সুযোগের সদ্ব্যবহারই বুঝায় : আর আমাদের এমন কোন সুযোগই হারাণ উচিত নয় যার মধ্যে একটা সৎকার্যের বা সৎচিন্তার ইঙ্গিত আছে এবং যেটার অনুশীলনে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার বাড়তে বাধ্য। আমাদের মধ্যে অনেকেই একাদিক্রমে কোন কিছু বিদ্যাভ্যাস করতে পারিনা, সকলেই কিছু আনন্দমোহন নই ; কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে এখান থেকে এক রতি ওখান থেকে এক রতি নিশ্চয়ই সংগ্রহ করতে পারি যদি আমরা হুঁশিয়ার হয়ে চলি।

শৈশব থেকেই আমরা শুনে আসছি 'যাকে রাখ, সেই রাখে'। কথাটা খাঁটি সত্য ; সেই মুহূর্তেই হয় তো জিনিসটার প্রয়োজন নাও হতে পারে, তবে সেটা যে কাজে লাগবেই সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

কি করা যাবে

কপর্দ্দকহীন মতিশীল প্রথম জীবনে ভাঙ্গা কাঁচ আর পুরনো শিশি বোতল পথে ঘাটে কুড়িয়ে জড় করে তাই বেচে তারই উপস্বত্বটা ক্রমশঃ বাড়িয়ে বাড়িয়ে কেমন করে একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, এটা গল্প হলেও সত্য। আমরা জনশ্রুতির ধার ধারি না বটে, কিন্তু এটাও ঠিক যে নীতি কথা কিছু ঘৃণার জিনিস নয়। তুচ্ছ হলেও তার শক্তি অসীম; আর প্রয়োজনে আসে না এমন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কিছু ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে আছে বলে তো মনে হয় না। বরং মনে হয় একদিন না একদিন নিশ্চয়ই সেই খুদে কিছুটাও উপকারে আসবেই।

শৈশবের আচার ব্যবহার থেকেই মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবিটা ফুটে ওঠে। ক্ষুদিরামের ছেলে গদাধর অর্থাৎ আমাদের সেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ হাতে খড়ির জন্য যখন পাঠশালায় যান তখন তাঁরও গুরুমশাইকে চমকাতে হয়েছিল, মাত্র তাঁকে দেখে! অত ছোট বেলায়ও তাঁর মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত শক্তি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যা দেখে গুরুমশাইকে মনে মনে বলতে হয়েছিল—"তাইতো, একি ব্যাপার? ইনি যে সর্ব্বশাস্ত্রে, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী মহাপুরুষ দেখ্‌ছি—এঁকে আমি কি শেখাব"? অনেক সময়ে ঠাকুরের অনেক প্রশ্নের সদুত্তর তিনি মাথা খুঁড়েও বার করতে পারতেন না—অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে থাকতেন—সেই খানেই উত্তর পেতেন, আর মনে মনে ভাবতেন তিনি বালককে কিছু না শেখাতে পারলেও তাঁর গুরুমশাই হয়েই ধন্য হয়েছেন।

কি করা যাবে

বালক নরেন্দ্রর মধ্যেও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবী জীবনের রূপ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। একদিন সন্ধ্যার পর ছাদের উপর আর আর ছেলেদের সঙ্গে তাঁর ধ্যানের খেলা চলেছে—সকলেই চোখ বুজে ধ্যানে বসে গেছে, এমন সময় একটা ফণাধারী সাপ সেখানে এসে উপস্থিত! একজন খেলার সাথী সেটা দেখা মাত্রেই 'সাপ' 'সাপ' বলে যেমন চেঁচাল—অমনি সবাই দিলে চম্পট; কিন্তু সে ধ্যানস্থ মহাযোগীর যোগ ভাঙল না! তিনি চোখ বুজে নীরব নিথর! ধ্যানেই তন্ময়! ক্রমশঃ বাড়ীর সমস্ত লোক ছাদে এল—কী সর্ব্বনাশ! সাপ তাঁর মাথার উপর ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে! খানিক পরেই সাপকেও চলে যেতে হ'ল—কিন্তু সেই দুর্জ্জয় সন্ন্যাসীর একাগ্রতার কাছে প্রচণ্ড পরাজয় স্বীকার করে।

আমরা রাজা রামমোহনের মধ্যেও অতি শৈশব থেকেই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাই। তিনি হাতে খড়ির দিন থেকেই যেমন পাঠশালায় গিয়ে বাঙ্গলা শিখতে সুরু করেন—সেই সময়েই—সেই পাঁচ বছর বয়সেই—সেই সঙ্গেই—পাঠশালা থেকে বাড়িতে এসে আবার পারসী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। এক সঙ্গে এই দু'টো বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করতে সেই পাঁচ বছরের শিশু যে অসাধারণশক্তির পরিচয় দিয়ে ছিল—জগতের ইতিহাসে তার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মেলে কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্রের মত হাতে খড়ির দিনেই একবার দেখে সমস্ত বর্ণমালা শিখতে না পারলেও, এটাতে বালক রামমোহনের স্মরণশক্তি ও প্রতিভা আমাদের কাছে রাজা রামমোহনের সম্যক্ পরিচয় তুলে ধরে।

কি করা যাবে

বালক আনন্দমোহন সম্বন্ধে শুনতে পাওয়া যায় যে একদিন তাঁর গণিতের অধ্যাপক তিনটি প্রশ্ন দিয়ে বলেন—"যে প্রথমটির উত্তর দিতে পারবে, সে শ্রেণীর সর্বোচ্চ গণ্য হবে, আর যে প্রথম ও দ্বিতীয়টির সমাধান করবে সে অতি অবশ্যই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবে"। আনন্দমোহন কিন্তু বিনীত ভাবে জানতে চায়—"আর, যে তিনটিরই উত্তর দিতে পারবে—সে কি হবে"? কিন্তু অধ্যাপক সেটাকে অসম্ভব মনে করেই বলেন— তা কেউ পারবে না, একান্ত যদি পারে তো সে কালে মাতৃভূমির গৌরবের সামগ্রী হ'বে"। সুযোগ্য ছাত্র তৎক্ষণাৎ তিনটি প্রশ্নেরই নির্ভুল সমাধান করে অধ্যাপক ও সতীর্থদের বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেন। বালক আনন্দমোহনের জীবনের এই একটা সামান্য ঘটনাই আমাদের কর্ম্মবীর আনন্দমোহনের সন্ধান দেয়।

একবার এক বড় মানুষের বাড়ীতে আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র শ্লোক রচনা করে দেন। বাড়ীওয়ালা সেই শ্লোক লিখে নানা দেশের পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করেন। দেশ দেশান্তর থেকে বড় বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা আসেন। সকলেই সেই শ্লোকের শত মুখে সুখ্যাতি করতে থাকেন—আর কোন্ মহাপণ্ডিত অধ্যাপক সেটা বিন্যাস করেছেন তা জানতে চান। বাড়ীর কর্ত্তা যখন ঈশ্বরচন্দ্রকে এনে তাঁদের সামনে ধরে বল্লেন যে—এই বালকই শ্লোক রচনা করেছে—তখন সকলে অবাক হয়ে পড়েন—বার বছর বয়সের ছেলের এমন অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে।

কি করা যাবে

সেই থেকেই বালক ঈশ্বরচন্দ্র মহাপণ্ডিত বলে পরিচিত হন। আর ভবিষ্যতের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সৃষ্টিও এইখানেই। কথায় বলে, 'উঠন্ত মুলো পত্তনেই চেনা যায়,' অর্থাৎ পরিণত বয়সের যা কিছু গুণগ্রাম তার অঙ্কুর শৈশবেই চোখে পড়ে। তাই বালক নরেন্দ্রনাথও ধরা পড়েছিলেন পরমহংস দেবের চোখে। তিনি নরেন্দ্রের মধ্যে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং করেছিলেন বলেই বলতেন—"তুই শিব, আমি শক্তি"।

পরম বৈষ্ণব, গোঁড়া হিন্দু রামকৃষ্ণ রায় বালক রামমোহনকে যে দিন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন, সে দিন তাঁরও বয়স মাত্র ষোল। তিনি ঘর ছেড়ে, বন্ধু বান্ধব ছেড়ে, কাতর না হয়ে, ভয় না পেয়ে বরং আপনার পায়ে নির্ভর করে শুধু ভবিষ্যতটাকেই সম্বল করে সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলেই আজ বর্ত্তমান ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। মাতামহ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত বিধর্ম্মী সন্তান হয়েও, তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে দেশ বিদেশের সকলের পূজা পেয়েছিলেন, তাঁদেরই আশীর্ব্বাদে, সময়ের সদ্ব্যবহার করেই।

কেউ কি কোনদিন বুঝতে পেরেছিল কিসের জন্য রাসবিহারী অত পরিশ্রম করেন। অত বড় গভীর আইনজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ ব্যবহার-জীবি, পয়সার অভাব নেই: অথচ তাঁর অর্থোপার্জ্জনের কামাই নেই কেন? যাঁর স্ত্রী, পুত্র পরিবার কেউ নেই, তাঁর এত অর্থের প্রয়োজনই বা কিসের?

কি করা যাবে

কেন তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে দিনের পর দিন, রাতের, পর রাত, নিঃশব্দে নিজের শরীর ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে, পরমায়ুকে ক্ষীণ করে চলেছেন। এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম নেই—সময়ের এমনই ব্যবহার—কি তাঁর উদ্দেশ্য। সারা জীবনের উপার্জ্জন দেশের উপকারে যে দিন তিনি ঢেলে দিয়ে ছিলেন—সেই দিনই সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীকে লোকে চিনতে পারে; বুঝতে পারে তিনি টাকাকে ভালবাসতেন—না দেশকে ভালবাসতেন। যারাই সাফল্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চাইবে, তাদেরই সময়ের নিয়োজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতেই হবে। এ না করলে সময়ের প্রতিও যেমনি অবিচার করা হবে—তেমনি অবিচার করা হবে নিজের প্রতিও।

আর একজন লোক যিনি সময়ের সদ্‌ব্যবহার জানতেন এবং নিজে একজন প্রকৃত কর্ম্মবীর ছিলেন তাঁর কথা না বললে এ প্রসঙ্গটার অঙ্গহানি হবে। এঁর নাম মহাত্মা প্যারী চরণ সরকার। এর 'ফার্ষ্ট বুক অভ্ রীডিং' পড়ে ইংরাজী শিখতে আরম্ভ করেননি এমন লোক, শুধু বাংলা দেশে কেন, সারা ভারতবর্ষে এক সময়ে ছিল না বললেই হয়। বড় লোকের ছেলেদের ফেলে দেওয়া কলম পেন্সিল কুড়িয়ে, উড়ুনিকে দু'খণ্ড করে তারই এক খণ্ড পরে, যাঁর বাল্যাবস্থা কেটে ছিল সেই ক্ষণজন্মা ও সার্থক-জন্মা মহাপুরুষের একদিন আয় হয়ে ছিল মাসে চার হাজার টাকা। কিন্তু সঞ্চয় যে কি তা তিনি জানতেন না—যেমন সময়েরও নয় —তেমনি অর্থেরও নয়।

কি করা যাবে

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মশাই তাই বলতেন, তিনি জীবনে মাত্র চার-জন মানুষ দেখে ছিলেন—তার মধ্যে একজন এই প্যারীবাবু। আমরা মুখে বলি 'সময় অমূল্য নিধি'। কিন্তু এর যত্ন করি কি? এর প্রকৃত মূল্য দিই কি? এটাকে অমূল্য রত্ন মনে করে সাবধানে নিয়ে নাড়া চাড়া করি কি? এর ব্যবহার জানি বলে তো মনে হয় না! জানলে এর সদ্‌ব্যবহার করে আমরা জগতের লোককে একদিন যেমন দেখিয়ে ছিলুম আজও তেমনি দেখাতে পারতুম আমরা কত বড় সময়সেবী—আমরা কত বড় উন্নত। সময়ের সেবা না করলে যেমন তার উপর অবিচার করা হয় তেমনই নিজের ওপরও বড় কম অবিচার করা হয় না।

সুষ্ঠু কর্মপ্রণালীর যেখানে অভাব সেখানে বুদ্ধিরও অভাব বলতে হবে—কেবল অভাব বোধ হবে না নিন্দা ও দুঃখের। তাই প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকই ঘড়ির কাঁটার মতন চলেন। কাঁটা যেমনি নিঃশব্দে ঘোরে, বুদ্ধিমান লোকও তেমনি নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যায়—সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দু'জনেই দেখে যে তাদের কাজেও তারা বেশ নিঃশব্দেই অতিক্রান্ত হয়েছে। কেবল তফাত এই যে ঘড়ি এক কাজই নির্দ্দিষ্ট ভাবে করে চলে—তার উঠতি-পড়তি নেই—কিন্তু মানুষের কাজ নিত্য নতুন আদর্শ নিয়ে নিত্য নতুন ভঙ্গীতে করতে হয় বলেই তাইতে তার উন্নতি।

কি করা যাবে

আমরা সময়কে বাঁচিয়ে রাখতে পারি কি ? কখনই পারি না। সময়ই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের প্রত্যেক দিনের, প্রত্যেক মাসের, প্রত্যেক বছরের প্রতিটি কাজ আমাদের মৃত্যুর পরেও আমাদের সাক্ষ্য দেয় না কি ? সময়ও কি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই মরে না ? সুতরাং সময় থাক্তেই আমাদের উচিত----যা করব তড়ি-ঘড়ি করবো—কাল করব বলে আজকের কাজটা ফেলে রাখব না বা পরের মুখাপেক্ষী হব না। আমাদের ছুটোছুটির তো কোনও আবশ্যকতা নেই, কারণ তা করলে কাজ তো অগ্রসর হবেই না বরং সময়টা নষ্ট হবে ও আরও দেরি হবে। তার চেয়ে অপেক্ষা করে যাতে কাজটা শেষ হয় সেটা করাই বাঞ্ছনীয় নয় কি ? এক সময়ে একটার বেশী দু'টো কাজ করতে যাব কেন ? সময়সেবকদের মধ্যে কেউ কি তা করেছেন যে আমরাও করব ?

আমাদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃতই বড় হয়েছেন বা সত্যিকারের উন্নতি করেছেন----তাঁরা প্রত্যেকে কেবল যে সময়সেবী তা নয়----রীতিমত সময় সম্বন্ধে মিতব্যয়ীও। কে না জানে যে উমেশ বসুর ছেলে সোমেশ বসু সময়কে বাঁচাবার জন্য এমন এক অলৌকিক মানসাঙ্ক আবিষ্কার করেছিলেন যার ফলে তিরিশটা রাশিতে তিরিশটা রাশি দিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে মুখে মুখে গুণ করে দিতেন। তাঁর এই অদ্ভুত গণনাকৌশল এবং সময়ের মিতাচার কি সত্যিই ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকাকে অবাক করেনি ?

কি করা যাবে

যে প্রশ্ন-পত্রের উত্তরের জন্য চার ঘণ্টা সময় নির্দ্দিষ্ট হয়েছে—সেই সব প্রশ্নেরই এক ঘণ্টায় উত্তর দেওয়াটা কি যথার্থই সময়ের পরিমিত ব্যয় হ'ল, বলা চলে না ?

রাজা রাজবল্লভ একবার পণ্ডিত রামগতি সেনের কাছে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ আর যজ্ঞ কুণ্ডের নক্সা চেয়ে পাঠান। রাজার তাগাদা অতএব খুবই জরুরী। কিন্তু রামগতি তখন নিজের মন্ত্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পুরশ্চরণ নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত—নিশ্বাস ফেলবার মত সময় নেই। অথচ রাজাও কিছু অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারেন না। অনন্যগতি হয়ে রামগতি কন্যা আনন্দময়ীকে প্রমাণ সহ নক্সা তৈরী করে পাঠাতে হুকুম দেন এবং সেই সব জিনিসই প্রমাণ্য বলে গণ্য হয়েছিল। পণ্ডিতের হাতে পড়ে যে জিনিস আশীর্ব্বাদ বলে গণ্য হচ্ছে, সেই জিনিসই কি আবার মূর্খের হাতে পড়ে অভিশাপ হয়ে উঠ্‌ছেনা ? এরই কৃপায় একজন পাচ্ছে পুরস্কার, একজন পাচ্ছে তিরস্কার; নয় কি ? তাই বলব আমাদের প্রতিবেশীর কাছে এটা মূল্যহীন হয় হোক্—আমরা এর যথার্থ মূল্য দেবই। পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেব সময় সম্বন্ধে আমাদের একটা ছড়া বলতেন,—

"সাতঘণ্টা দাওগে পাঠে,
ঘণ্টা দশেক হাটে বাটে;
সাত ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিও,
নারায়ণে সবটা দিও"।

কি করা যাবে

ছন্দে গাঁথা উপদেশটা প্রতিদিনই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে আর সেই সঙ্গে ভেসে ওঠে তাঁর কর্মবহুল জীবনের ছবি। প্রত্যেক-মহাপুরুষের জীবনটাকে তন্ন তন্ন করে দেখলে দেখা যাবে, সময়ের মূল্য তাঁদের কাছে কতখানি। কে জানে ধার্ম্মিক, কে জানে শ্রমিক, কে জানে ব্যবসায়ী আর কে জানে সদাশয়ী, যাঁরাই বিখ্যাত বড় হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের জীবনের প্রতি মুহূর্তটিকে সদ্‌ব্যবহার করেই যে বড় হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতেই পারে না। তাই তাঁদেরই কণ্ঠে পরিস্ফুট ধ্বনিত হয়েছে—

"মায় গুলাম্, মায় গুলাম্,
মায় গুলাম তেরি।
তু দেওয়ান্, তু দেওয়ান্,
তু দেওয়ান্ মেরি"।



কি করা যাবে ?

সম্বন্ধে

-ঃ * ঃ——

তাই তো কি করা যাবে ? এই প্রশ্ন আজ প্রত্যেক ছেলের মুখে মুখে। আমাদের মুখেও সেই ধরণেরই প্রশ্ন ; সত্যই তো, কি তাকে করতে দেওয়া যায় ? পড়াশুনা শেষ করে সে যে বেরুল, এখন তাকে দুনিয়ার হাল চালটা বুঝতে হবে—দেখ্‌তে হবে ; সুতরাং কোন্ পথ সে ধরবে ? যে পথই ধরুক না কেন, কোনটাই সহজ নয়। আর এই সংসারে প্রথম পা বাড়ানর মতন দুষ্কর ব্যাপার নেই বললেও চলে। এই যে পদক্ষেপ এটা থেকে নির্ব্বিঘ্নে বা সুযোগ মত পিছু হটাও অনিশ্চিত। পা ফেলা মানেই, নিয়তি নির্দিষ্ট পথে ভবিষ্যতকে সাব্যস্ত করতে এগিয়ে চলা এবং এটাও অবধারিত যে এই পদবিক্ষেপে সিদ্ধকাম বা ব্যর্থকাম যে যা হ'বে তার মীমাংসাও হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

অবশ্য আমি তাদের কথা বলছি না যারা সোনার ঝিনুক রাটি মুখে করে জন্মেছে—যাদের কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হবার বালাই নেই ; আমি শুধু তাদেরই কথা বলছি যাদের একটা না একটা বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন ভিন্ন জীবিকা সংস্থানের আর কোনও উপায় নেই।

কি করা যাবে

কেননা যারা সমৃদ্ধ, তাদের কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয় না বলেই তারা প্রথমে একটা ভুল পথ ধরলেও সেটাকে ছেড়ে ঠিক পথে ফিরে আসতে পারে—তা'তে তাদের বিশেষ কিছু যায় আসে না।

কিন্তু যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, অথচ গরজ বড় বালাই যাদের, তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা যখন একান্তই অপরিহার্য্য, তখন পথ বাছাবাছি—কাজ বাছাবাছি তাদের অনিবার্য্য ভাবেই দরকার নয় কি ? নইলে কাজটা যে তাদের ওজন মাফিক না হয়ে পণ্ডশ্রম হবে। অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করে ছিলেন বলে যে সবাই করবে, রাম হরধনু ভেঙ্গে ছিলেন বলে যে সবাই ভাঙ্গবে, হনুমান গন্ধমাদন তুলে ছিলেন বলে যে সবাই তুলবে, এ আশা করা অন্যায় নয় কি ?

হনুমানের বোঝা হনুমানই বইতে পারে; সবাই পারবে কেন ? তাই সিদ্ধিলাভ করতে হলে ডানপিটে বা অসম-সাহসী যুবক মাত্রেরই গোড়াতে চাই মনের স্বাচ্ছন্দ্য আর আত্মার শান্তির সঙ্গে সঙ্গে যে বৃত্তিটা সে অবলম্বন করতে চাইছে সেটা তার সামর্থ্যের উপযুক্ত কিনা সেটা দেখা। নইলে পরাজয় সুনিশ্চিত। যে প্রতিভা একজনকে ভাল উকিল তৈরী করে, সেটাই যদি তাকে ভাল রাসায়নিক করতে লাগান যায়, তো সেটার অপব্যয় হতে বাধ্য। একজন জন্মাবধি গায়কের পক্ষে গানের আসর ছেড়ে বাঁশের ব্যবসায় করতে গেলে যে জয়শ্রী তাকে ফেলে পালাবে—এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদেরই জ্ঞান গোঁসাই।

কি করা যাবে

যে সাহস, যে তেজস্বিতা, যে যোজন-ক্ষমতা মানুষকে সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠা করে, সেই অসামান্য ক্ষমতাই আবার সেই মানুষকেই অকর্মণ্য কেরানী করে জাহির করে না কি ? ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়েব সঙ্গে যে কোন প্রণালীবদ্ধ শ্রমের কাজ করা যাক্ না কেন, যদি ঠিকভাবে বিবেচকের মত সেটাতে চেষ্টান্বিত থাকা যায়, তা হ'লে কাজটা ফলপ্রসূ না হয়ে পাবে না। কিন্তু যদি তার পবিবর্ত্তে অসামান্য প্রতিভাশালী হবাব জন্য মনটা আচম্বিতে আঁকু পাঁকু কবে ওঠে তা হলে সেই উৎকট বাসনার নিদারুণ পরিসমাপ্তি ঘটবেই ঘটবে। আমাদেব মানতেই হবে যে ছাগল দিযে যব মাড়ান সম্ভব হলে, হেলে গরুর প্রয়োজন সত্যই হ'ত না।

মায়েব তুলাল সাধক বামপ্রসাদ ছিলেন দরিদ্র অথচ সংসারটি ছিল তাঁব প্রকাণ্ড। মা. স্ত্রী, তু'টি মেয়ে ও একটি ছেলের ভরণ পোষণ তাঁকে কবতে হ'ত ; এ ছাড়া অতিথি অভ্যাগত ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও যে ছিলনা এমন নয়। তাই সংসার-চিন্তা যখনই তাঁকে ইষ্ট-চিন্তা ভুলিযে দিত, তখনই তিনি মনকে ধিক্‌কার দিয়ে বলে উঠতেন—

"মন হারালি কাজের গোড়া,
তুমি দিবানিশি ভাবছ বসি,
কোথায় পাবে টাকার তোড়া"।

কালীর বেটা রামপ্রসাদকে কি আর টাকাওযালা সংসারী করা সম্ভব ?

তাই যারাই সে চেষ্টা করতে গেছে, তাদেরই তিনি ভৎ´সনার স্বরে জানিয়ে দিয়েছেন—

"চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র,
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া"।

প্রত্যেক পিতার কর্তব্য যাতে তাঁর সন্তানের ওপর চাপ না পড়ে সে দিকে দৃষ্টি রাখা—অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামে পুত্রের প্রতিবন্ধক হওয়া চলবে না—হতে হবে সকল অসুবিধার্ মধ্যেও তার সর্ব্বোচ্চ সহায়। যাতে সে অকৃতকার্য্য হয়, এমন কোনও অনুপযুক্ত ভার তার ঘাড়ে চাপান যেতে পারবে না—অসুবিধায় ফেলা তো দূরের কথা। কাজের অসামঞ্জস্যই কর্ম্মীকে অসামাল করে এটা আমাদের মনে রাখতেই হ'বে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে যৌবন-সুলভ ভীরুতা আর প্রকৃত অক্ষমতা এক জিনিস নয়।

আমাদের সেই কাজেই হাত দেওয়া উচিত. যেটা আমরা করতে **পারব** বলে স্থির জানি, এবং যেটা করতে আমাদের প্রাণ চায়—কারণ এটাই সিদ্ধিলাভের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। নরেন্দ্রনাথ যে দিন ছুটে এসে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ধরে বসেন—"মাকে বলে 'আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন;" সে দিন ঠাকুরও তাঁকে জবাব দিয়ে ছিলেন—ওরে, আমি ত কতবার বলেছি—তুই মাকে বলিস্‌না, সেই জন্যেই তো মা শোনে না!"

কি করা যাবে

আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ স্থির করবার পূর্বেই আমাদের মন থেকে অসঙ্গত ভয়টা তাড়াতে হবে। ভয়টাই আমাদের একটা মস্ত বড় দুর্ব্বলতা। মনকে যে যত নির্ভীক করে তুলতে পারবে, সে তত বড় হবে। এর বেশী উঠলে পা পিছলাতে পারে এই বদ্ধ ধারণা ভিন্ন, অন্য কোন বাধাতেই আমরা পশ্চাৎপদ হব না—এই হবে আমাদের পণ।

যৌবনসুলভ সংকোচ মোটেই দুর্বলতা নয়। যৌবনটা সব সময়েই উদ্দাম ও তেজীয়ান্ কারণ সে পরিণামদর্শী হ'তে চায় না; তার পক্ষে শেষে - কি - হ'বে বোঝা প্রায় অসম্ভব। আমাদের শক্তি বা সামর্থ্য কতটুকু, এটা জানবার মত বোধ - শক্তি আমাদের পুনঃপুনঃই হচ্ছে, তবে সেটা তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। ওই শোন ঋষিবাক্য—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

আমি করে নেব—এই আত্মবিশ্বাস চাই। এটা দম্ভ নয়; এটা অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তির ফল—এটাই যথার্থ জ্ঞান। এ না থাকলে মানুষ হীন হয়ে পড়বে—এই কঠোর জীবন সংগ্রামে কোন মতেই টিক্তে পারবে না। দারিদ্র্য শুধু যে দেহকেই দুঃখ দেয়, তা নয়—মনকেও হত্যা করে, এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। 'সর্বশূন্য' দানতার হাত থেকে বাঁচতেই হবে।

কি করা যাবে

নৃত্যপর উদয়শঙ্করের বাল্যাবধি ভাষার প্রতি অনুরাগ না থেকে, ছিল নৃত্যের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি ; তাই তাঁর অভিভাবকেরাও তাঁকে পণ্ডিত করার আশা ত্যাগ করে নর্তকের নেতৃত্বাধীনে দিয়েছিলেন—নৃত্যবিদ্ হবার জন্যে। একেই বলে সঠিক নীতি নির্ধারণ এবং তারই অনুসরণ—এখানে অব্যবস্থিত চিত্তের কোন বালাই নেই।

কিন্তু আমরা কি আমাদের চারিদিকে দেখছি না, কী অবিরাম চেষ্টাই না চলছে—কণ্ঠস্বরহানা মেয়েদের গায়িকা করে তোলার জন্যে—আবার অত্যুত্তম শিল্পীকে ডাক্তার, উকিল বা মাস্টার করবার জন্যে ? জীবনের গতিবেগকে এ ভাবে বিপর্যস্ত বা নষ্ট করার জন্য দায়ী কে ? অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী পিতা মাতার চেষ্টা নয় কি ?

ছেলে স্বভাবসিদ্ধ নিপুণতার সঙ্গে খুব ছোট বয়সেই চটপট এবং টুকটাক করে যেমন তার যন্ত্রপাতির ছোট্ট বাক্সটি নাড়তে সুরু করলে, অমনি বাপ তাকে পাঠালেন কলেজে—উচ্চ-শিক্ষার জন্য। সেখানে সে নিজেকে জাহির করা চুলোয় যাক্, নামে মাত্র পাশ করে, কোন রকমে রগড়ে-মগড়ে কালক্রমে যখন একটা ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে এল—তখন সরষে ফুল ছাড়া তার চারিদিকে সে কিছুই দেখতে পায় না। ডাক্তার হ'ল তো রোগী নেই ; উকিল হ'ল তো মক্কেল নেই ; আর মাষ্টার হ'ল তো কথাই নেই—দিন চলা ভার।

কি করা যাবে

আবার এও দেখা যায় যে ইচ্ছাকে চেপে রাখলে হার ভিন্ন জিত হয় না। লেখা পড়া শিখে মা-বাপের দুঃখ ঘুচাতে পারবেন এই ভরসায় হেমচন্দ্র প্রাণপণে পড়াশুনা করতেন। তিনি জানতেন বৃত্তি না পেলে কেবল যে সংসারে টানাটানি হবে তা নয়, পড়াশুনাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সাধমত চেষ্টা করে জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় পাস করে দুই বছরের জন্য মাসিক পঁচিশ টাকা করে বৃত্তি পেলেন বটে কিন্তু তবুও তাঁর পড়াশুনা হ'ল না।

ঠিক সেই সময়েই তাঁর মাতামহের মৃত্যু হ'ল—পিতা কৈলাসচন্দ্র ছ'টী ছেলেমেয়ে, স্ত্রী আর নিজের খাওয়া পরার ভাবনায় চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। হেমচন্দ্রকে বাধ্য হ'য়ে বাপ মা ভাই বোনের মুখের দিকে চেয়ে মিলিটারী অডিট অফিসে মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা মাস মাইনের একটা চাকরি স্বীকার করতে হ'ল।

স্বাভাবিক ভাবে যিনি হাইকোর্টে ওকালতি করার জন্য জন্মেছেন, তাঁকে কি বাপ মা কেরানীগিরি করতে পাঠালেন না? যিনি একদিন সারা বাংলাদেশে কবি হেমচন্দ্র বলে পরিচিত হয়ে ছিলেন, তাঁকে কি বাধ্য হয়ে টুলে বসে জমা খরচের খাতা লিখতে হয়নি? চাষীর দেশের সেই প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, যাঁর এক একটি গানে বাঙ্গালীর শরীর আজও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, তিনিও কি কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য অনর্থক বিলেতে যাননি?

কি করা যাবে

তাঁর পরবর্ত্তী জীবন ব্যাপার কি নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেনা যে কৃষি বিদ্যাটা তাঁর যথার্থ অস্ত্র হয়নি : সেটা তাঁর কোন কাজে লাগেনি। আর একজন প্রতিভাশালী লোক যাঁর জীবনটা ব্যাঙ্কের খাতায় সুন্দর হাতের লেখা লিখেই প্রায় নষ্ট হব হব হয়ে ছিল তিনিই হলেন বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয় কেশব চন্দ্র সেন।

কলিকাতার কাঁসারি পাড়া অঞ্চলে জাতিতে তিলি ব্যবসাদার দোকানী পসারীর ঘরের একজন ছেলে, অন্তরে লেখাপড়া শেখার এক অসীম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, দিনের পর দিন কৌতূহল ও আগ্রহ-পুষ্ট চোখে স্কুলের ছেলেদের দিকে চেয়ে থাকত আর ভাবত— না জানি পূর্ব্ব জন্মের কত পুণ্যের ফলেই ওরা পড়তে পারছে, শিখতে পারছে—ওরা নাজানি কত সুখী!

আর তারই অভিভাবকেরা তখন তাকে, লেখা পড়ার পরিবর্তে পৈতৃক কারবারে ঢুকিয়ে নিচ্ছেন, যাতে সেই অল্প বয়স থেকেই সে উত্তমরূপে পাকা হয়ে, ভাল ব্যবসাদার গড়ে উঠতে পারে। কেননা, দরিদ্রের সংসারে আর কোন উপায় তাঁদের ছিল না—ছেলের মনোভাব জেনেও বাপ মা কিছু করতে পারেননি।

কিন্তু একজন তা পেরে ছিলেন। ভক্তের কাতর ডাকে ভগবান্ এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়ে ছিলেন— বালক ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য।

কি করা যাবে

ইস্কুলের সকল শিক্ষক এবং কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁর লেখা পড়ার প্রবল অনুরাগ ও মনোযোগ দেখে, তাঁকে উপযাচক হয়ে এক পয়সাও মাইনে দিতে হবে না এই প্রতিশ্রুতি দিলে, বালক দাঁড়িপাল্লা ফেলে মনের আনন্দে পূর্ণোদ্যমে লেখাপড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিলেন। এই বালকই কালে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত রাজনৈতিক মহাপুরুষ রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পাল সি. আই. ই নামে জগতের কাছে পরিচিত। কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী কলেজ স্কোয়ারে আজও যাঁর প্রতিমূর্তি ভক্তি সহকারে পূজা করছে এ সেই মহাত্মা।

বিচারক জানকীনাথ, যিনি চুঁচুড়ার বাঘ নামে খ্যাত এবং 'হাল ফ্যাসান', 'কুসুমাঞ্জলী' ও 'সন্ধ্যা বন্দনার' রচয়িতা, ব্যাণ্ডেলের নিকটবর্ত্তী রাজহাটের অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আনন্দ পণ্ডিতের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। ডাফ্ স্কুলে এবং হুগলী কলেজে যখন তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ক্রমশঃ ফুটে উঠতে থাকে তখন তাঁরই শিক্ষকেরা তাঁর শত ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্র দেখেও তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য বলতেন—

"কি হয়েছে, জানকী! খাট, অবিরাম চেষ্টা করে লেখা পড়া শিখে নাও; তুমিও একদিন হুগলীর জজের মত পোষাক পরে ঘুরে বেড়াবে, ভাবনা কি!" যদি তাঁর জনক জননী তাঁকে বনেদি পণ্ডিতি ব্যবসাতে ধরে রাখতেন তাহলে কতবড় একটা প্রতিভা বিচার বিভাগ ও সাহিত্য থেকে বঞ্চিত হত?

কি করা যাবে

কিন্তু তা হবার নয় বলেই, শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ বরদা দে মশাই তাঁর ধী-শক্তির কথা ছেড়ে দিয়েও, তাঁর নির্ভীকতা ও তেজস্বীতায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে সেখানকার পাদরী স্কুলে বিনা বেতনে ভরতি করিয়ে দেন।

এইখানে কয়েক বৎসর কাটিয়ে জানকীনাথ চুঁচুড়ায় তাঁর মাতুলালয়ে এসে ডাফ্ স্কুলে এক বৎসর অধ্যয়ন করার পর বৃত্তি নিয়ে এনট্রান্স্ পাস করেন। শ্রীরামপুরেই বালক জানকীনাথ এমনি করে তাঁর দেহটাকে গড়ে তুলে ছিলেন যে তাঁর শেষ দিনটিতেও কেউ তাঁর দেহ বা মনে এক রত্তি দুর্ব্বলতা খুঁজে পায়নি

আবাল্য-নির্ভীক জানকীনাথের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী তাই বলতেন—

"জানকীর দেহ ও মনের জোরই তাকে কোনও দিন রোগগ্রস্থ করতে পারেনি"।

কলেজে যখন বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ উপস্থিত হ'ল, তখন তাঁর আর বই-য়ের জন্য ভাবনা রইল না। কে জানে ঘটনাচক্রে কি ভাবে নৈহাটির স্বনামধন্য দেবোপম মহাপুরুষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্পর্শে এসে তাঁর আর লেখা পড় শিখে মানুষ হবার সম্বন্ধে কোনও ভাবনা—কোনও অভাবই হয়নি।

কি করা যাবে

সারা ভারতের বৈজ্ঞানিকদের এমন কি প্রত্যেক বাঙ্গালীর এটা মনে করে কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠা উচিত নয় কি, যে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর পিতা, তাঁকে বিজ্ঞান জগত থেকে টেনে এনে চিকিৎসক করতে পারেননি। তা না হলে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা আর উদ্ভিদ্ তত্ত্বের কত জিনিসই না আমরা হারাতাম! রেডিওর পরিচয় হয়তো আমরা পেতাম না! যদিবা পেতাম, বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কারক একমাত্র মার্কনি সাহেব বলেই মেনে নিতাম!

মানুষের মত গাছেরও যে প্রাণ আছে, আর সেই প্রাণেও সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে—একথা আজও আমাদের অজানা থাকতো! তারপর শিল্পী নন্দলাল বসুর সঙ্গে হয়তো আমাদের এমন সত্যিকারের পরিচয়ই হ'ত না! বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গায়ে প্রাচীন ভারতের চিত্রাবলীও হয় তো ফুটতেই পেত না! চিত্রকার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাল্পনিক 'মা'কে হয়তো কেউ দেখতেই পেত না! বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র তাঁর সারা জীবনের সাধনা দিয়ে যদি একে রূপায়িত করে না যেতেন—বাঙ্গালী সত্যিই কি না হারাত।

যথাযথ বৃত্তি অবলম্বন করার ভুলে আমাদের এমন সব দুর্গতি ভোগ করতে হয় যে তা থেকে সাম্‌লে উঠতে প্রাণান্ত হতে হয় না কি? শরৎ চন্দ্রের মামার বাড়ীর সেই উকিল হবার কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা যদি তাঁর ধাতে সইত—তাহলে আজ আমরা তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য গল্প উপন্যাস না পেয়ে ওকালতনামা পেতাম না কি?

কি করা যাবে

ভাগ্যে তুষ্ট সরস্বতী মাঝে মাঝে তাঁর কাঁধে ভর করত—তাই না পেয়েছি 'পরিণীতা', 'দেবদাস,' 'পল্লীসমাজ,' 'রামের সুমতি,' 'চন্দ্রনাথ', আর 'শ্রীকান্ত'র মধ্যে তাঁর সত্যিকারের পরিচয়। আমরা তাঁর পরের পুকুরে মাছ ধরার আর পরের বাগানে ফলমূল চুরি করার মজাটাই টের পেতাম না!

খুব ছোট থেকেই যদি রবীন্দ্রনাথ স্কুলে যাবার নামে একেবারে বেঁকে না বসতেন, নানা অজুহাতে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে সুরু না করতেন—তাহলে তাঁর পিতার ইচ্ছানুযায়ী আমরা তাঁকে ব্যারিস্টার রূপেই দেখতে পেতাম না কি? কিন্তু তাঁর চঞ্চল যৌবনের নিত্য নতুন ভাবের জোয়ার, নিত্য নতুন কল্পনার ঢেউ তাঁর শখ আর সামর্থ্য সম্বন্ধে এতটাই সচেতন ও অচঞ্চল ছিল, যে তিনি কোন দিনই না ভেবে পারতেন না—

"আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,
আমি জগত প্লাবিয়া
বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা"।

পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে সেদিন যদি তিনি ব্যারিস্টার হতেন, তা হলে আজ তাঁর এ সব লেখা বাঙ্গালী পড়তে পেত কি? তাঁর গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গ-কৌতুক, বাঙ্গালীর মন হরণ করতে পারত কি?

কি করা যাবে

আজ বাংলা ছাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষের এমন কি সুদূর সাগর পারের ইওরোপের চিত্তকে দোলা দিত কি ? কার 'গীতাঞ্জলি' পড়ে মুগ্ধ পাশ্চাত্য তার মাথায় 'নোবেল প্রাইজের' মুকুট পরিয়ে দিত ? বাঙ্গালীর সেই কবি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙ্গালীকে আজ কে এমন করে বলতে পারত ?—

"বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক্ সত্য হউক্
সত্য হউক্ হে ভগবান্"।

তাঁর অন্তর্নিহিত প্রতিভা আশৈশব পরাজয়কে প্রত্যাখ্যান করেই এগিয়ে গেছে ! যখনই যেখানে যতটুকু সময় পেয়েছেন তিনি বিশ্ববাসীকে তাঁর সে সুমধুর বীণার ঝঙ্কার শুনিয়ে গেছেন ; এমন কি জমিদারীর কাজকর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত থেকেও, পদ্মার ঢেউয়ের তালে তালে, নানা ভাবের কল্পনার ঢেউ তুলে সে সময়েও, তিনি তাঁর লেখার মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন তুলতে ছাড়েননি। এই পরিণতিই তাঁর আত্মবিশ্বাসের প্রতীক, এবং এরই জন্য বাঙ্গালী সাধারণ কবি না পেয়ে পেয়ে ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে।

তবে এই খানেই একটা কথা জেনে রাখা দরকার, যে আমাদের প্রবৃত্তি আর প্রতীতি এক জিনিস নয়।

কি করা যাবে

প্রবৃত্তি হল সাধারণ পছন্দ এবং প্রতীতি হ'ল আসল প্রতিভা। আমরা একটু ব্যঙ্গ করতে বা ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে চাই বলেই যে আমরা সবাই ভবানী বাঁড়ুজ্যে হব এটা মনে করাই ভুল। একটু সরোদ বাজাতে পারি বলেই যে নির্ঘাত কুকুব খাঁ হব—এটা আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই নয়। দু'দশ খানা প্রতিভা-শালী লোকের জীবন-চরিত বা তারা কেমন করে দারুণ বাধা বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করে প্রথিতযশা ও সৌভাগ্যবান্ হয়েছেন জেনে, আমরাও যদি মন্ত্রমুগ্ধের মত উত্তেজিত হয়ে মনে করি, আমাদের সামনেও ঠিক ঐ এক রকমই দেদাপামান পথ ও পুরস্কার পড়ে আছে—সুতরাং আমরাই বা আমাদের শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক ও পরমাত্মীয়দের যুক্তি যাচ্ এগুলোকে প্রত্যাখ্যান না করব কেন—তা হলে সেটা পাগলামি করা হবে না কি?

এটা নিঃসন্দেহ যে বাপ মা বা অভিভাবকদেরও ভুলচুক হয়; কিন্তু তার চেয়ে বড় ভুলচুক করি আমরা, কেননা আমরা অতৃপ্ত ধনাকাঙ্ক্ষা ও অবিমৃশ্য যশোলিপ্সা নিয়ে এমন পথে পা বাড়াই যে পথে পা ফেলার আমরা একেবারেই অযোগ্য! সাধারণতঃ যাঁরাই আমাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠ তাঁদের পরামর্শ নেওয়া এবং সেইমত চলাটাই হ'ল সবচেয়ে প্রশস্ত! হয় তো পেশাটা প্রতিকূল হ'তে পারে এবং কালক্রমে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলেও মনে হতে পারে। তা'তে ক্ষতি কি? তৎক্ষণাৎ সেটাকে ছেড়ে আমরা আর একটা কাজে লেগে যেতে পারব যদি তা'তে কোনও অনিষ্ট না হয়।

কি করা যাবে

এতে আর একটা সুবিধা এই হবে যে পরবর্ত্তী কাজের কঠিন ভাগটা অনেকটা সোজা হয়ে আসবে এই আমাদেরই কাছে। সকল-মহাপুরুষের জীবন চরিত আলোচনা করলেই দেখতে পাওয়া যাবে, যেমনএকটু আগেও আমরা দেখেছি, যে তাঁদের প্রতি অনুপরমাণুতে প্রচণ্ড একটা তেজ ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আপন শক্তিতে এমনি ভাবে এগিয়ে চলে—যাকে বাধা দেওয়ার মত ক্ষমতা কারও নেই।

কিন্তু আমরা একথাও অত্যন্ত বিনীতভাবেই বলব যে যাঁদের মধ্যে প্রতিভার এই দিব্যজ্যোতিঃ দেখতে পাওয়া যায়—তাঁরা খুবই অল্প সংখ্যক এবং এই জগদীশ্বরের জ্যোতির্ময় রাজ্যে মানুষের কাজের বিচার, কাজের দীপ্তিতে হয় না হয় সাধুতায়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কাজ করে যাব চাই নেতাও হতে পারি, চাই নগণ্য অবস্থাতেও থাকতে পারি

কাজে নিযুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে—নাম, যশ ঐশ্বর্য্যভোগ, এমন কি ইহলোক পরলোকের সব চিন্তা ত্যাগ করে -একমাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির উচ্চ সঙ্কল্প নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আর মনে রাখতে হবে সেই ঋষিবাক্য—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

কর্ম্মেই আমাদের অধিকার, ফলে আমাদের অধিকার নেই।

কি করা যাবে

পাহাড়ের মত অটল অচল হ'তে হ'বে—লোভের আবর্জ্জনা স্তূপকে দু'পায়ে মাড়িয়ে যেতে হ'বে—ঝড় ঝাপটার ভয়কে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে হবে—মাথায় নিতে হ'বে পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, আর অধ্যবসায়ের ভারি বোঝা—মুখে থাকবে প্রেমের অকপট অভিব্যক্তি—আর বুকে থাকবে জগদ্‌গুরুতে জলন্ত বিশ্বাস।

আমাদের এই অসহায় অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হবে—আমাদের বাপ মা, আমাদের দেশ, আমাদের দিকে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে রয়েছে। শুধু বাংলা নয়, সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে বড় বড় জিনিস প্রত্যাশা করছে এবং করবে। আমরা কোন ভেল্‌কি বা ইন্দ্রজালের সাহায্যে এটা করে তুলতে পারব না—বা এটাও সম্ভব নয় যে আমরা প্রত্যেকেই এক এক জন ভাস্কর, চিত্রকর, কালোয়াত, পণ্ডিত, কোটিপতি সওদাগর বা উৎপাদক হবই হ'ব।

তবে আমাদের নিরাশ হওয়া চলবে না। যত ছোট বা যত বড়ই হোক না কেন, সব কাজেই আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের মধ্যে একজন হবার ইচ্ছাটাকে জাগিয়ে রাখতেই হবে। মানুষ হ'তেই হবে—আমাদের বুঝতেই হবে যে শত শত যুগের কঠোর চেষ্টার ফলে একটা চরিত্র—একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠে—তড়াক্ করে সেটা হ'য় না। অপমান, অখ্যাতি ওসব আবার কি? কাজের ছোট বড় বা বাছবিচারের উপর নিন্দা বা সুখ্যাতি মোটেই নির্ভর করে না। সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাদের মনে প্রাণে কাজটা করার উপর।

কি করা যাবে

জুতা ব্যবসায়ী হওয়ায় ততটা অপমান নেই, যতটা অপমান বাজে ও খারাপ জুতা তৈরী করায় আছে। আমাদের শুঁড়ী হওয়ায় ততটা পাপ নেই যতটা পাপ মদের মধ্যে জল মিশিয়ে বিক্রি করায় আছে। আমাদের অপাপবিদ্ধ হতে হবে।

যে মোহের বশবর্ত্তী হয়ে বাপ মা তাঁদের ছেলেদের কেরানীর চাকরিতে বাহাল করতে চান—কিনা, তারা পাখার তলায় আরামে চেয়ারে বসে ইস্পাতের সঙ্গে বড় বড় অঙ্কের তেবিজ দিয়ে প্রকাণ্ড একটা দারিদ্র্যের তেজারত তৈরী করবে- সেটা যে সত্যিই কোন ব্যবসায় বাণিজ্য বা শ্রমসাধ্য কাজের চেয়ে নিকৃষ্ট—এর মীমাংসা আজও অসমাপ্ত রয়ে গেল। আমরা ব্যাঙ্কের বা সওদাগরি অাপিসের যে কোন কেরানীর জলজ্যান্ত চিত্র প্রত্যক্ষ করেছি বলেই আজ আর আমাদের সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা জানি এর মধ্যে কি মজার আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্য লুকানো আছে।

পাঁচ বছর বয়স হতে না হতেই সেই যে কাঠের বেঞ্চিতে বসা সুরু হল—তারপর একে একে রোজ স্কুলে গিয়ে শেখা সহিষ্ণুতা, ন্যায়নিষ্ঠা আর পাটীগণিতের ভগ্নাংশ। খুব বেশীদিন নয় —মাত্র বছর দশ এটা করার পরই হাতে একখানা একাউণ্টেন্সির বই আর বুকে একটা কলম গুঁজে কোন রকমে নাকে মুখে দুই এক গ্রাস দিয়েই, ছুট্। সেখানে সেই উদয়াস্ত কলম-পেষা —প্রথমটা মিনি মাইনেয়, পরে অবশ্য মাইনের কথাটা, "দেওয়ালিমে দেখা জা'গ"। হায় রে আমরা!

কি করা যাবে

বিড়ম্বনার এইখানেই শেষ নয়। দু'চার বছরের মধ্যেই ঝড়, জল, রোগে অভ্যস্ত ও অভেদ্য হতে হবে—তবেই মাইনে হ'বে ষাট টাকা। নিদেন পক্ষে পাঁচ মাইল রোজ যেতে এবং আসতে হবে হয়ত কারুর বগলে ছাতাটি রইল—কারুর তাও রইল না। তারপর বিয়ে হলেই বেতন বৃদ্ধির আবেদন নিবেদনের উত্তরে সেই মামুলী জবাব—তোমাকে না হলেও কার্মের চলবে। ক্রমশঃ ছাপোষা হওয়ার ফলে তাদেরই খাতায় হিসাব-নবিসি করে রাত ন'টার পর বাড়ী ফেরা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না।

যতই দিন যেতে থাকে টাকা পয়সা জমান তো দূরের কথা ধোপা, নাপিত, জামা, জুতো, আর ইস্কুলের মাইনে দিয়েই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না—তার আবার গৌরী সেন হবে। যদি বা রাত্রে একটা কাজ চেষ্টা করলে মেলে—তখন চোখ আর চলে না— তারই বা কসুর কি? শেষে একদিন দেখা যায় চেয়ারটা খালি —তখন সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য চাঁদা তুলতে।

এরই মোহে আমরা বিব্রত ও বিভ্রান্ত। যদি বা কোন রকমে এ বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তো ডাক্তার, উকিল, আর মাষ্টারের দল ভারী করতেই ব্যস্ত। কিন্তু আমরা এটা ভুলে যাই যে যারা সুনাম ও সম্ভ্রমের পূজারী এ ত্রয়ীর পূজা কেবল তাদেরই জন্য। নইলে আবার এই ত্রিগুণ ত্রিদোষ হয়ে, আমাদের ছুতোর, কামার, এবং চাষীকেও নষ্ট করবে।

কি করা যাবে

লাঙ্গল ধান ক্ষেত ছেড়ে হয়ত বা ত্রিশূল হয়ে ফিরে দাঁড়াবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা প্রায়ই এমন কত শত লোক দেখতে পাই যারা চাষ আবাদ ছেড়ে ওকা'লতি ইত্যাদি করছেন বটে. কিন্তু সতৃষ্ণ নয়নে এখনও সেই ধান জমীর দিকে চেয়ে চেয়ে হা হুতাশ করতে ছাড়ছেন না। একদিন যেটা মান সম্ভ্রম হানিকর মনে করে পরিত্যাজ্য হয়েছে, কালে সেটাই আবার জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত হচ্ছে—কেননা তখন মন ও মুখে প্রায় এক। সুতরাং সমাজে এমন সব লোকের অভাব নেই যারা নিজের ব্যবসায়, বৃত্তির অযোগ্যতা সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধি করেও একমাত্র দুর্বলতার সাহায্যেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে -শক্তি সামর্থ্যের সাহায্যে করে না। আর করে না বলেই তারা ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের পথেই এগিয়ে চলে।

সত্যই কি,—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ?" আমাদের কিন্তু মনে হয় এই নীতি বাকাটা একটা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা কখনও আমাদের সংকল্পকে দৃঢ়ীভূত বা সীমাবদ্ধ করতে পারি না। যাঁরা আমাদের মধ্যে ধীর স্থির, বা আত্মতৃপ্ত তাঁদের কথা ছেড়ে দিলেও যাঁরা সংযমী হলেও গৃহের কর্তব্য কর্মে উদাসীন নন, আমাদের মত আকাশ কুসুমের কল্পনা তাঁরা না করলেও, তাঁদের কি গৃহস্থালির করণীয় ব্যাপারে যতই বাধা আসতে থাকে, আকাঙ্ক্ষা-পূরণের উদ্যম ততই বাড়তে থাকে না ?

কি করা যাবে

তাঁদের মধ্যেও কি উত্তরোত্তর কোন কিছু পাবার বা কোন কিছু হাসিল করবার মতন মতলব জাগে না ? তবে আর ভাবনা মোতাবেক কার্য্যসিদ্ধি হল কৈ ? উৎকট আকাঙ্ক্ষাই তো কেবল বেড়ে চলল ? চিন্তামনি আমাদের চিন্তিত করে তুললেই কি আর চিন্ময় করেন ? আমাদের মধ্যে শিল্পী বা চিত্রকর হবার দুর্দান্ত ইচ্ছা থাকলেই, যে আমরা চৌষট্টি রকম উঁচুদরের কলা প্রতিভার অধিকারী হবো, এমনটা বিশ্বাস করা যায় কি ? যৌবনে সদ্য সদ্য রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যদি বিশ্বকবি হবার বাহাদুরি নেবার জন্য রাশীকৃত কাব্য-গ্রন্থ লিখে ফেলি—তা হলে সেগুলির কি অবস্থা হবে ? আমাদের সেই কাজ ও কল্পনাশক্তি দু'এরই অন্তর্জলি কি কলকাতার ফুট্‌পাথে আর বেনের দোকানে হবে না ?

সুতরাং আমাদের মতে যে কোনও বিষয়েই চেষ্টা করা যাক্‌না কেন—সিদ্ধিলাভ নির্ভর করে একমাত্র হিম্মতের উপর ! হিকমতের সঙ্গে হিম্মতকে লাগাতে পারলে দুঃসাধ্য কাজেও হিমসিম খেতে হয় না ! কোনও মানুষই মহান্ হতে পারে না, যদি না সে হৃদ্‌গত ভাবে কাজে ডুবে যায়। এটা সন্দেহাতীত ভাবেই ঠিক, যে রাধানাথ শিক্‌দারের বৈজ্ঞানিক হবার জন্য প্রবল আগ্রহ ছিল, আবার এটাও ঠিক যে সেই ঔৎসুক্যের আতিশয্যে আকুল হয়ে যদি না তিনি ভূগোল আর ভূবিদ্যাতে প্রাণ ঢেলে দিতেন তা হলে আর "মাউণ্ট এভারেস্টের" আবিষ্কার সম্ভব হ'ত না।

কি করা যাবে

কিন্তু তা বলে আমরা এটা মানতে রাজী নই যে ইচ্ছা থাকলেই শক্তি সামর্থ্যের অভাব হবে না—সুতরাং কৃতিত্ব অনিবার্য্য। তা হয় না! সেটা কল্পনা। তবে যদি ইচ্ছা কাজে পরিণত হয়, যদি তার মধ্যে কৃতনিশ্চয় হবার মত একটা বজ্র সঙ্কল্প থাকে, যদি সেটা অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং অন্তর্নিহিত শক্তিকে উৎসাহিত করতে পারে—তবেই এবং একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব।

হুগলী ত্রিবেণীর এবং পরবর্ত্তী কালে শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ম্মকার গভীর রাতে একলা বসে বসে বাংলা হরফের ছেনি কাটা বা ছাপা ঢালাই নিজের হাতে করে ছিলেন বলেই যে তিনি বাংলা হরফের জন্মদাতা তা নয় কর্ম্মকার হিসাবে বাংলা হরফ তৈরী করবার ইচ্ছাই যে তাঁকে বড় করেছে এ কথাও ছেঁদো কথা। তার নিরলস চেষ্টায়—আর তার মনে প্রাণে এই শিল্পটিকে ভালবাসার দরুন—আজ বাঙ্গলার এই ছাপার কারবার এতটা গড়ে উঠে তাঁকে এই কাজের অগ্রকর্ম্মী বলে সম্মান দিতে কার্পণ্য করেনি।

তাঁর জামাই মনোহরও শ্বশুরের কাছে বাতির অভাবে চাঁদের আলোর নীচেই ছাঁচিম নিয়ে শেখে একাদিক্রমে চল্লিশ বছর কাল শ্রীরামপুরের এই শিল্প ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে, উৎকৃষ্ট বাংলা, দেবনাগরী, ওরিয়া ও পারসী মুদ্রাক্ষর তৈরী ক'রে সারাটা দেশকে যে ঋণী করে রেখে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কি করা যাবে

এই খানেই মূর্ত্ত হয়ে ছিল দৃঢ় সঙ্কল্প আর তার সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা—এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক প্রতিভা। আমাদের জীবনের লক্ষ্য যাই হ'ক না কেন, এটুকু সব ক্ষেত্রেই মনে রাখতে হবে, যেন আমাদের উদ্দেশ্য সৎলোকের অযোগ্য না হয়। বদনাম হবে, এমন কোনও নিন্দনীয় আদর্শ আমরা গ্রহণ করতে একেবারেই চাই না; এমন কি প্রাণপণ যত্ন বা চেষ্টা করে মাত্র গড্ডালিকা প্রবাহে কালাতিপাত করতেও আমরা অনিচ্ছুক! আমাদের অনুক্ষণ একমাত্র এই অভিপ্রায় নিয়েই চলতে হবে যে নারায়ণ আমাদের যেটুকু বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েছেন আমরা যেন সেটুকুর সদ্‌ব্যবহার করতে পারি—প্রথমটা মানুষের মতন—তারপর হিন্দুর মতন সামাবদ্ধ হয়েও অকপটে।

সদিচ্ছার অন্তরায় হতে আমরা চাই না কেননা জীবাত্মা মাত্রেই উৎকর্ষের কাঙাল। তবে আমরা তাদের জন্য একান্তই দুঃখিত যারা একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষারই দাস। সামাজিক কল্যাণে পরিশ্রম করা দোষাবহ নয়। টাকার জন্য আমরা খাটাখাটি নিশ্চয়ই করব যেহেতু সংসারে থাকতে গেলে টাকা চাইই। তবে সেটা ধর্মানুগত হয়ে—প্রাণহীন কৃত্রিম যন্ত্র বা জন্তু হয়ে নয়। কেননা ঘুণ-ধরা আগ্রহ ছাড়া মনস্তুষ্টির দিক দিয়ে ধন দৌলত বা সামাজিক মর্যাদা যে খুবই নগণ্য আদর্শ এবং সেটা যে সদাশয়ের সদ্‌গতির সহায়ক নয়, এটা সনাতনী সত্য। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে—তবে আমরা লেখাপড়া নিয়ে দিন রাত কাটাই কেন?

কি করা যাবে

কেনই বা আমরা আমাদের জীবনের অমন সুসময়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি এবং চিন্তায় নিবিষ্ট থাকতে যাই ? এর সদুত্তর মিলবে—যদি দিনান্তে নিভৃতে আমরা আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়কে জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, কি উদ্দেশ্যে আমরা খাটছি ? কি মতলব আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করছে ? আমাদের চরম লক্ষ্যটার তাৎপর্য্যই বা কি ? যদি জীবনে শুধুই গণ্যমান্য হবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা ব্যস্তসমস্ত থাকি তা হলে উত্তর হবেই যে সেটা খুবই কদর্য্য আর নিকৃষ্ট লক্ষ্য। যে লোক নিজের ধর্ম্ম মেনে তারই নির্দ্দেশ মত জ্ঞানের সার সত্যতে অক্লান্ত না হয়ে সেটাকে অগ্রাহ্য করে চলে, তাকে আমরা শ্রদ্ধা করতে অপারগ। হিন্দু হয়ে কেউ যদি হিন্দুর কৃষ্টিকে, তার উদার পবিত্রতাকে, তার অভিলাষের মৌলিকতাকে তার আপনার সত্ত্বাকে না হারিয়েও পরকে নিজের অঙ্গীভূত করে নেবার চেষ্টাকে প্রশস্তি করতে কার্পণ্য করে—তা হলে আমরা তাকে আহাম্মক ছাড়া আর কি বলতে পারি ?

একটু ধীর ভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে সংগ্রামই মানুষকে বড় করে তোলে—পুরস্কার কোন দিন কাউকে বড় করেনি—করতে পারে না। বকশিশের আশায় যে মশগুল, সে আঘাত সইতে পারে কি ? অসাধ্য সাধনের ঝুঁকি নেওয়া ভিন্ন সৌভাগ্যের পথে পা বাড়ানই ত দুষ্কর। অভিপ্রেত রাস্তা এতই কণ্টকিত যে প্রতি পদক্ষেপে সাম্‌লে চলতে না পারলে গা ছিঁড়ে কুটে যাবেই।

কি করা যাবে

সুতরাং আমরা তাকেই বাহবা দোব যে সত্যিকারের নির্ভীক কর্ম্মী; তার কাজে সফলতাই থাকুক আর বিফলতাই থাকুক সে যে দুর্নিবার এবং দুর্ধর্ষ হলেও সদাচারী, মাত্র এই জন্যই সে ধন্যবাদের যোগ্য। সেই সব চেয়ে ভাগ্যবান্ যে জন্মগত প্রেরণা প্রাপ্ত হয়ে কেবল কাজ নিয়েই সুখী; আবার এমনও দেখতে পাওয়া যায় যে খুব সামান্য কিছু থেকেই মানুষের সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই! সত্যিই কি একটা আগুনের ফুলকি একটা বারুদের স্তূপে পড়ে গোটা সহরটাকে জ্বালাতে পারে না? খুবই পারে। ইচ্ছা, সহানুভূতি, আর শক্তি যদি থাকে তাহ'লে সামান্য একটু প্রেরণা পেলেই সেটা ঠিক পথ নেবেই নেবে।

ছেলে যা চাইবে, যুবক তা চেষ্টা করবে, বুড়ো তা পাবে—এ স্বতঃসিদ্ধ। আমরা যদি সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালার একটু পরিচয় নিতে চেষ্টা করি তাহ'লে, কি দেখতে পাই? দেখতে পাই না কি যে গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের প্রোঃ বোস যার পিতা, তাঁকেও পিতামাতার মনোমালিন্যের ফলে পিতার স্নেহ যত্নে বঞ্চিত হয়ে মার সঙ্গে কলকাতার দর্জ্জিপাড়ায় এসে কি কষ্টই না সহ্য করতে হয়েছে? যে বাঙ্গালীর মেয়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ডবল প্রমোশন পায়, তাকে কিনা হাসপাতালের নার্সের চাকরি করতে হয়! কণ্ঠমাধুর্য্যে ভবিষ্যৎ জীবনে গোটা ভারতকে যে মাতিয়ে তুলবে তার কি ও কাজ মনোমত হতে পারে?

কি করা যাবে

তাই ইন্দুবালাকে একদিন সকলের অজ্ঞাতে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তার মা, ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর ও গহরজানের কাছে। ছোট বেলায় ছবি আঁকতে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল বলেই যে তিনি অতুলনীয়া গায়িকা হতে পেরেছেন তা নয়। সংগীত বিদ্যাকে আয়ত্ত করতে যে অসহ্য কষ্ট ও নির্য্যাতন তিনি সহ্য করেছিলেন তা একাধারে যেমনই মর্ম্মস্পর্শী তেমনই অমানুষিক। তবুও তাতে ব্রতী হয়ে পর্য্যন্ত তাঁর একাগ্রতার অভাব হয়নি। তাঁর দৃঢ়তা, স্বভাবসিদ্ধ পরাক্রম ও প্রতিভার সংমিশ্রণে আজ তাঁকে এত বড় কৃতিত্বের অধি কারিনী করেছে—যদিও তাঁর উন্নতির মূলে আছে উঁচুদরের আত্মতৃপ্তি।

পরিশ্রম যা ফলপ্রসূ হয় তার উৎস একমাত্র অন্তর্জাত জ্ঞান আর উচ্ছ্বসিত ইচ্ছার মধ্যেই সন্নিবিষ্ট। আমরা শুনেছি কোলাপুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে গোখ্‌লে খুব অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন। তাঁর বড় ভাই অতি কষ্টে তাঁর পড়ার খরচ চালাতেন; কোলাপুরের স্কুলেই তার লেখাপড়া আরম্ভ হয়। গোখ্‌লে তখন নিতান্ত ছেলে মানুষ, নীচের শ্রেনীতে পড়েন। এক দিন শিক্ষক মশাই ক্লাশে একটি অঙ্ক কষতে দেন, অঙ্কটি শক্ত ছিল, তাই কেউ সেটি কষতে পারলে না। ঘটনাক্রমে ঐ অঙ্কটিই গোখলেকে অন্য একজন লোক একদিন কষে দিয়েছিলেন. তাই গোখলে সেটি কষতে পারলেন।

কি করা যাবে

অঙ্কটি কষতে পেরে ছিলেন বলে শিক্ষক মশায় তাঁকে প্রথম স্থানে গিয়ে বসতে বলেন; কিন্তু গোখলে সেখানে বসেননি। পরন্তু তিনি বলে ছিলেন যে, এ অঙ্ক তিনি নিজের বুদ্ধিতে করেননি বলেই এতে তাঁর কোনও বাহাদুরি নেবার অধিকার নেই।

এত অল্প বয়সে এ রকম নীতিজ্ঞানের পরিচয় আমরা রমেশচন্দ্র দত্তের মধ্যেও দেখতে পাই। সর্ব্বদা খুড়োর সান্নিধ্যে থেকে, খুড়োকে অনুকরণ করে, এঁর স্বভাব চরিত্রও দিন দিন খুড়ো শশীচন্দ্রের মত হয়ে উঠে ছিল। শশীচন্দ্র ছিলেন 'বইয়ের পোকা' —সব সময়েই পড়াশুনা—কেবল বই হাতেই থাকতেন। এতে তিনি কি আনন্দ পান, তাই জানবার জন্যে রমেশচন্দ্রের বড় কৌতূহল হয়। তাই তাঁর দেখাদেখি উনিও সেই রকম করতে আরম্ভ করেন। দিন কতক করার পরই বুঝতে পারেন সত্যই এর ভেতর কি আনন্দ, কি মধু আছে—কেন লোকে সংসার ধর্ম্ম ভুলে গিয়ে এতে ডুবে যায়। রমেশচন্দ্রও সেই থেকেই সাহিত্যের পূজারী হয়ে ওঠেন—কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্রে আগ্রহ তাঁর ক্রমশঃ কমে যায়। সুতরাং কলেজে ভর্ত্তি হয়ে যখন তাঁর বেশী গণিত চর্চ্চা করার দরকার হয়, তখন তিনি সে দিকে মন দিতে পারেননি।

বাংলার স্বনামধন্য মহাপুরুষ স্যার গুরুদাস বাঁড়ুজ্যে সে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের সহকারী অধ্যাপক—এদিকে তাঁর নজর পড়ে।

কি করা যাবে

তিনি এক দিন রমেশচন্দ্রকে কাছে ডেকে প্রশ্ন করেন,—"তুমি এক দিনও অঙ্ক কষে আননা কেন?" সত্যবাদী রমেশচন্দ্র স্পষ্ট উত্তর দেন যে অঙ্ক কষতে তাঁর মোটেই ভাল লাগেনা. ওর ভেতরে তিনি ঢুকতে পারেন না—ইচ্ছাও হয় না। তখন অধ্যাপক গুরুদাস তাঁকে বুঝিয়ে দেন, যে যদি তিনি সাহিত্যের মত অঙ্কটাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে চেষ্টা করে দেখেন তা হলে অঙ্কটাকেও তিনি আয়ত্ত করতে পারবেন—এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়। ফলে হয়ে ছিলও তাই; মহা কঠিন 'সিবিল সার্ভিস' পরীক্ষায় এই অঙ্কের সাহায্যেই প্রতিযোগিতায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ছিলেন।

চুঁচুড়ার আনন্দ পণ্ডিতের ছেলে জানকীনাথের সম্বন্ধেও শোনা যায় যে তিনি কাগজ পেন্সিলের অভাবে মাতুলালয়ের সংশ্লিষ্ট ধনীর সুবিস্তীর্ণ শান-বাঁধানো রকের ওপর এক হাতে ন্যাতা আর অন্য হাতে খড়ি নিয়ে এমন মনোযোগের সঙ্গে বি, এ. ক্লাসের আঁক কষতেন যে বারংবার ডেকেও তাঁর সাড়া পাওয়া যেত না।

শেষে অনেকক্ষণের পর হয়ত বা একবার চমকে উঠে 'এাঁ' বলে ফিরে চাইতেন। বালক কৃষ্ণদাস পালেরও এমন আশ্চর্য্য রকমের মনোযোগ ছিল যে পাঠ্যাবস্থায় স্বয়ং গুরুমশাই পর্য্যন্ত তাঁকে ডেকে উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হয়ে বলতেন—"গাধা ছেলেটা ঘুমুচ্ছে বুঝি?"

কি করা যাবে

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলতেন যে তাঁর বাপ তাঁকে শৈশবে যে ইস্কুলে পড়তে পাঠিয়ে ছিলেন সেখানে তাঁর ডান দিকে বসতো তাঁর বাপের মুসলমান চাপরাসীর ছেলে, আর বাঁ দিকে এক জেলের ছেলে। তাদের কাছে তিনি পশু পাখী আর জলজন্তুর কথা স্তব্ধ হয়ে শুনতেন এবং সেই সব শুনে শুনেই তাঁর মনে প্রকৃতির কার্য্য অনুসন্ধানের একটা প্রগাঢ় অনুরাগ যে জন্মে ছিল- এটা ছিল তাঁর বদ্ধমূল ধারণ।

শোনা যায় যে দ্বিজেন্দ্রলালের বয়স যখন চার কি পাঁচ হবে তখন তাঁর বাপ একদিন একটা গান হারমোনিয়ম বাজিয়ে গেয়েই বিশেষ কাজের তাগিদে বেরিয়ে যান। দ্বিজেন্দ্র এক মনে তাঁর হাত আর আঙ্গুল নাড়া দেখে ছিলেন। বাপকে উঠে যেতে দেখে তিনি হারমোনিয়ম নিয়ে বাপ যে গানটি বাজাচ্ছিলেন তাই বাজাতে চেষ্টা করেন। ইত্যবসরে তাঁর বাপ ফিরে আসেন এবং তাকে তদবস্থ দেখতে পান। তিনি আর কিছু না বলে তাকে বাজাতে বলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় ঠিকই বাজিয়ে ছিলেন। বাংলার এই যে সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এটা রবি ঠাকুরের কাব্যে আকৃষ্ট থাকলেও অর্থশাস্ত্রের সুপণ্ডিতের ভেতর যেমন দেখা যাবে— তেমনি দেখা যাবে প্রতিভাশালী রাজকর্ম্মচারীর ভেতর — দেশপূজ্য সামাজিক নেতার ভেতর - স্বদেশ প্রেম ও স্বজাতি-প্রীতিতে উদ্‌বুদ্ধ গোঁড়া হিঁদুর ভেতর — বিজ্ঞান-জগতকে নব নব আলোয়

উদ্ভাসক বহুমুখী বৈজ্ঞানিকের ভেতর—আর সেই সুনিপুণ স্থপতির ভেতর যিনি তাজমহলের মতন স্থাপত্যেরও নির্মাতা।

এরূপ প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত থেকে আমরা আর কিছু না হলেও এটুকু বেশ বুঝতে পারি যে আমাদের অবলম্বিত বৃত্তি তা সেটা যতই দৈবিক বা আকস্মিক মনে হ'ক না কেন সেটা আদতে হচ্ছে আমাদের সুচিন্তিত নির্ব্বাচনেরই ফল। 'রাস্তার ঝাড়ুদারও দেশ ভক্ত হতে পারে', এ কথা বলার জন্যে অঘোর নাথের মেয়ে সরোজিনী বাগ্মী হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না হননি—খ্যাতি লাভ করে ছিলেন দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশা ও পরাধীনতার জ্বালা তাঁর সংবেদনশীল মনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে বক্তৃতা দিতে অনুপ্রাণিত করে ছিল বলেই।

শৈশবে মধুসূদন মা ও বাড়ীর অপরাপর মেয়েদের কাছে রামায়ণ মহাভারতের কথা ও অন্য সব গল্প শুনতেন; গল্পের উপর তার প্রবল ঝোঁক ছিল। কিন্তু সেই জন্যেই তিনি বাঙ্গালীর মহাকবি হননি; ওগুলো শুধু তার প্রাণের ভেতর ভাবের ঢেউ তুলেছিল আর তার মনের গুপ্ত ও সুপ্ত রচনা-শক্তিকে জাগিয়ে দিয়েছিল মাত্র।

সামান্য কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর ছেলে, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, বাপের কাঠের ব্যবসা তেমন লাভজনক না হওয়ায় শেষে বোম্বাইতে এসে এক বিখ্যাত দালালের অধীনে চাকুরী নিয়ে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে ক্রোরপতি হয়ে ছিলেন।

কি করা যাবে

তাঁর এই চমকপ্রদ জীবনী তাঁকে বোম্বাইএর তুলোর গাঁট রপ্তানির প্রধান দালাল বা বিশিষ্ট ব্যাঙ্কার করেনি তবে হয়তো কতকটা পরিমাণে তাঁর চেষ্টার মধ্যে ঝুঁকিদারী স্পৃহার প্রবর্তন করে ছিল। তাঁর তেজস্বিতা, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তাঁর তীক্ষ্ণ বিচার ক্ষমতা আজও আমাদের কাছে তাঁকে অমর করে রেখেছে। তাই তাঁরই মধ্যে আমরা যেন এই নিদ্রাতুর জাতকে বিদ্যাপতির কথায় বলতে শুনি—

"গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার"।

এই রকম শত শত উদাহরণ দিয়ে আমরা আমাদের যুক্তির সত্যতা প্রমাণ করতে পারি। আমরা দেখাতে পারি যে কেবল বুড়ো বয়সেই মানুষ আসক্তি বা আবেগের বশীভূত হয়ে পড়ে না—যৌবনেও সেটা সবচেয়ে তাকে পেয়ে বসে—তাই এই সময়টাই ওটাকে নিয়ন্ত্রিত বা সংযত করার প্রকৃষ্ট সময়। জয়দেব, সেই কোমলকান্তপদাবলীর স্রষ্টা, তাঁর 'গীত গোবিন্দ' রচণা করেছেন বোধ হয় যখন তাঁর বয়স মাত্র চোদ্দ। আশুতোষ মাত্র ষোল বছর বয়সে 'কনিক সেক্সান' লিখে ছিলেন। বাশুলী দেবীর মন্দিরে চণ্ডিদাস প্রথম যখন তাঁর নিজের তৈরী গান গেয়ে দেবীর পূজা আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স হয়তো বা এগার হবে। বাঙ্গালীর সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র একদিন বলে ছিলেন যে তিনি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন রাশিয়ার উপর জাপান মস্ত এক বিজয় লাভ করে।

কি করা যাবে

যে সংসারে আমরা জন্মাই তার প্রভাব আমরা কখনও এড়াতে পারি না। তার সে জন্মগত শিক্ষা ভোলা তো দূরের কথা সব চেয়ে বেশী মনে থাকে। ছেলে কেমন দাঁড়াবে তার অনেকটা তার বাড়ীর হালচাল দেখে ধরা যায়। আমাদের তো কই তেমন নাম জাদা বা মহৎ লোক একজনও নজরে পড়েনা যিনি যথার্থ পবিত্র বা মঙ্গলময় সংসারে জন্মগ্রহণ করেননি। বাল্যকালটা যেমন গ্রহণেচ্ছু তেমনই অনচিকীর্ষু—তার মধ্যে যা কিছু ঢালা যাবে সবই শুষে নেবে আবার আশপাশের যা কিছু দেখবে তাও নকল করবে।

আমাদের মনুষ্যত্বটা বেশীর ভাগ দেনদার স্ত্রীজাতির কাছে তার আমাদের ছেলে বেলাটা সব চেয়ে অধিক ঋণী মায়ের কাছে। আমরা অনেকটা আমাদের মা যেমন করে গড়ে দেন ঠিক তাই থাকি! তাঁর মুখ থেকে আমরা যে কথাগুলো শুনে শিখি, সাধারণতঃ সেই শিক্ষাই আমাদের পারের কড়ি হয়।

তাই দাক্ষায়ণীর ছেলে জানকীনাথ ঠিকই বলতেন যে তাঁর মা ছিলেন একশ' জন শিক্ষকের সমকক্ষ। শচিমাতা না থাকলে প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেবকে কি আমরা পেতাম? ঈশ্বরচন্দ্র, আশুতোষ, গুরুদাস, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ভুদেব ও দাদাভাই নৌরজী এঁরা সকলেই কি নিজ নিজ মায়ের কাছে কম ঋণী? এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই যেন মায়ের পুরোপুরি ছাপটাই পড়েছে।

কি করা যাবে

তাঁর এই চমকপ্রদ জীবনী তাঁকে বোম্বাইএর তুলোর গাঁট কম্পানির প্রধান দালাল বা বিশিষ্ট ব্যাঙ্কার করেনি তবে হয়তো কতকটা পরিমাণে তাঁর চেষ্টার মধ্যে ঝুঁকিদারি স্পৃহার প্রবর্তন করে ছিল। তাঁর তেজস্বিতা, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তাঁর তীক্ষ্ণ বিচার-ক্ষমতা আজও আমাদের কাছে তাঁকে অমর করে রেখেছে। তাই তাঁরই মধ্যে আমরা যেন এই নিদ্রাতুর জাতকে বিদ্যাপতির কথায় বলতে শুনি—

"গণইতে দোষ গুণলেষ ন পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার"।

এই রকম শত শত উদাহরণ দিয়ে আমরা আমাদের যুক্তির সত্যতা প্রমাণ করতে পারি। আমরা দেখাতে পারি যে কেবল বুড়ো বয়সেই মানুষ আসক্তি বা আবেগের বশীভূত হয়ে পড়ে না - যৌবনেও সেটা সবচেয়ে তাকে পেয়ে বসে—তাই এই সময়টাই ওটাকে নিয়ন্ত্রিত বা সংযত করার প্রকৃষ্ট সময়। জয়দেব, সেই কোমলকান্তপদাবলীর স্রষ্টা, তাঁর 'গীত গোবিন্দ' রচণা করেছেন বোধ হয় যখন তাঁর বয়স মাত্র চোদ্দ। আশুতোষ মাত্র ষোল বছর বয়সে 'কনিক সেকসান' লিখে ছিলেন। বাশুলী দেবীর মন্দিরে চণ্ডিদাস প্রথম যখন তাঁর নিজের তৈরী গান গেয়ে দেবীর পূজা আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স হয়তো বা এগার হবে। বাঙ্গালীর সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র একদিন বলে ছিলেন যে তিনি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন রাশিয়ার উপর জাপান মস্ত এক বিজয় লাভ করে।

কি করা যাবে

যে সংসারে আমরা জন্মাই তার প্রভাব আমরা কখনও এড়াতে পারি না। তার সে জন্মগত শিক্ষা ভোলা তো দূরের কথা সব চেয়ে বেশী মনে থাকে। ছেলে কেমন দাঁড়াবে তার অনেকটা তার বাড়ীর হালচাল দেখে ধরা যায়। আমাদের তো কই তেমন নাম জাদা বা মহৎ লোক একজনও নজরে পড়েনা যিনি যথার্থ পবিত্র বা মঙ্গলময় সংসারে জন্মগ্রহণ করেননি। বাল্যকালটা যেমন গ্রহণেচ্ছু তেমনই অনচিকীর্ষু—তার মধ্যে যা কিছু ঢালা যাবে সবই শুষে নেবে আবার আশপাশের যা কিছু দেখবে তাও নকল করবে।

আমাদের মনুষ্যত্বটা বেশীর ভাগ দেনদার স্ত্রীজাতির কাছে আর আমাদের ছেলে বেলাটা সব চেয়ে অধিক ঋণী মায়ের কাছে। আমরা অনেকটা আমাদের মা যেমন করে গড়ে দেন ঠিক তাই থাকি। তাঁর মুখ থেকে আমরা যে কথাগুলো শুনে শিখি, সাধারণতঃ সেই শিক্ষাই আমাদের পারের কড়ি হয়।

তাই দাক্ষায়ণীর ছেলে জানকীনাথ ঠিকই বলতেন যে তাঁর মা ছিলেন একশ' জন শিক্ষকের সমকক্ষ। শচিমাতা না থাকলে প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেবকে কি আমারা পেতাম? ঈশ্বরচন্দ্র, আশুতোষ, গুরুদাস, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ভুদেব ও দাদাভাই নৌরজী এঁরা সকলেই কি নিজ নিজ মায়ের কাছে কম ঋণী? এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই যেন মায়ের পুরোপুরি ছাপটাই পড়েছে।

কি করা যাবে

মায়েরা হাতে করে যে বীজগুলি পুতেছিলেন তাতেই দেখবার মত ফল ফলে ছিল। বিচারক জানকীনাথ তাঁর "মাতৃস্মৃতি" কবিতায় তাঁর মায়ের সঙ্গে চিকিৎসকের বাদানুবাদের একটা চমৎকার ছবি এঁকেছেন। কবি মৃত্যুশয্যায়—ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছেন। তবুও তাঁর মা ডাক্তারকে তখনও ভৎর্সনা করে বলছেন,—

"হে ভিষক্! কোন যন্ত্রে মাপিলে হে আয়ু,
কুমারের মম? তব শাস্ত্র বিধিলিপি
পারে কি খণ্ডিতে? সন্তানের প্রাণবায়ু
বিধাতৃ বিধানে জননী-হৃদয়-তন্ত্রী
সহ নিবন্ধিত, হৃদয়-দর্পণ নহে
ম্লান করি অনুভব ভাবী অমঙ্গল
ছায়া—বাছার আমার,"...............

এই পূজ্যপাদ মহাপুরুষ প্রায়ই বলতেন যে তাঁর মায়ের ঐ তিরস্কার সে যাত্রায় তাঁর পক্ষে রক্ষকরূপ পুরস্কার হয়ে ছিল।

দ্বারকা নদীর পূব তীরে তারাপীঠ। তারাপীঠের ক্ষ্যাপা এক দিন দ্বারকায় স্নান করতে করতে দেখতে পেলেন তাঁর ভাই রামচরণ কাঁদতে কাঁদতে নদীর ওপারে মায়ের শব নিয়ে উপস্থিত —সৎকার হবে। নদীতে তখন বান ডেকেছে, ঝড় উঠেছে; নদীর ভীষণ অবস্থা! •কার সাধ্য পার হয়?

কি করা যাবে

মাতৃস্নেহে ভরপুর বামা ক্ষ্যাপার প্রাণটা হাহাকার করে উঠল—মা কি তবে নেই! ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপার মতই চিৎকার করে বললে—"মা—আমার মা! তোমরা যেমন করে পার, এ পারে আন। ওপারে নয়—এপারেই মার সামনে মার কাজ হবে!"

ওপারে যাবা ছিল তারা শুনে হাসলে! কেউ বা ভেংচে বললে—মার অসুখে একদিন সেবা করতে আসতে পারেনি—এখন দরদ উথলে উঠল"। নদীর ওপারেই সৎকারের ব্যবস্থা হচ্ছে দেখে 'জয় মা তারা' বলে বামাচরণ সেই খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিলেন। চারিদিক থেকে লোক চিৎকার করে উঠল,—"ক্ষ্যাপা, ওরে ক্ষ্যাপা! ডুবে মরবি। ফিরে আয়—ফিরে আয়"।

কে কার কথা শোনে? প্রচণ্ড তখন বাতাসের গর্জন! নির্ভীক বামাচরণ কোনও দিকে দৃকপাত না করে, ঢেউএর সঙ্গে লড়াই করতে করতে নদী পার হলেন এবং চিতার উপর থেকে মরা মাকে বুকে তুলে নিয়ে ভাসতে ভাসতে এপারে এলেন। লোকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল—ধন্য, ধন্য মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে। ক্ষ্যাপার মা মায়ের সামনে আর এক মায়ের চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল—দ্বারকার এপারে ওপারে কেবলই তখন ধ্বনিত হচ্ছিল—"জয় মা তারা—জয় মা তারা! মা, মা—আমার মা!" আর কোনও শব্দ নয়।

কি করা যাবে

ঠাকুরের জীবনীর গোড়াতেই আছে, চন্দ্রমণি স্বামীর ভাত বেড়ে দিয়েছেন, ক্ষুদিরাম খেতে বসবেন এমন সময় দ্বারদেশে শোনা গেল—"বাড়ীতে কে আছেন? অতিথি এসেছে গো"! আর খাওয়া হ'ল না, বাড়া ভাত পড়ে রইল, ক্ষুদিরাম শশব্যস্তে উঠে গিয়ে অতিথিকে আদর করে ডেকে এনে বসালেন। তারপর স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন।

বড় মানুষের বাড়ীতে তো আর অতিথি পূজো পায় না, পায় পয়সা—নয়, বড় কথা—সুতরাং এ বাড়ীতে এ রকম আদর যত্ন পেয়ে তিনি বড়ই তৃপ্ত হলেন। অতিথি সেবার পরে স্বামীকে খাইয়ে চন্দ্রমণি যখন নিজে খেতে বসলেন, তখন ভাতের হাঁড়ি খালি বললেও চলে। তিনি তাতে কিছু মাত্র দুঃখিত না হয়ে—যে ক'টি অন্ন অবশিষ্ট ছিল, তাই খেয়েই পরিতৃপ্ত হলেন। তিনি যে অসময়ে অতিথি সংকার করতে পেরেছেন—এই আনন্দেই তিনি আটখানা—ভগবান যে তাঁকে বাঁচিয়েছেন।

বিকেলে যাবার সময় অতিথি বলে গেলেন,—"চাটুয্যে মশাই! আপনি গরিব হলেও, আপনার গরিবানার মধ্যেও যে ধর্ম্মাচরণ দেখলুম, তেমন আর কোথাও দেখিনি! আপনি পরার্থপর বটে! দয়াময় আপনার এই পুণ্য কাজের পুরস্কার দেবেনই। আপনার ঘরে এক মহাপুরুষের জন্ম হবে—আর দেবতার মতন আপনার বংশ চিরকাল পৃথিবীর লোকের শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজো পাবে। দেখবেন এ ব্রাহ্মণের কথা কখনও মিথ্যা হবে না"।

কি করা যাবে

"ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যা হয় না—এই সামান্য ক্ষুদ-কুঁড়োতে যে আপনার তৃপ্তি হয়েছে — এই আমার পরম সৌভাগ্য", বলে ক্ষুদিরাম ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়ে ভিতরে এসে চন্দ্রমণিকে বললেন,—"আজ নারায়ণ আমাদের বড় রক্ষা করেছেন। ভাগ্যে আমি খাইনি, নইলে সে দুঃখ আর রাখবার জায়গা থাকতো না। আজ তো ঘরে বিশেষ কিছুই ছিল না, তবুও ব্রাহ্মণ নিজ গুণে সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ পর্যন্ত করে গেলেন"।

স্বামীর কথা শুনে চন্দ্রমণির চোখে জল এল। স্বামী যে তাঁর দেবতা, নারয়ণ। সুতরাং তাঁর আশীর্ব্বাদে তিনি যে তাঁরই কাজ করতে পেরেছেন মনে করে ধন্য বোধ করলেন। তাঁর মুখে আর কি প্রত্যুত্তর থাকতে পারে? এমন বাপ মায়ের যে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মত ছেলে হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? এমন ধাম্মিক, হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরে লালিত পালিত হয়ে কেউ দেবতা ভিন্ন আর কিছু হ'তে পারে কি?

দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে যেটুকু সরলতা, স্নেহপ্রবণতা ও প্রখর স্মৃতি-শক্তি ছিল, সেই সব সদ্‌গুণের অধিকারী তিনি হয়ে ছিলেন তাঁর মা প্রসন্নময়ীর কাছ থেকে। প্রসন্নময়ী ছিলেন প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য বংশের মেয়ে। দ্বিজেন্দ্রলাল বলতেন যে তিনি যখন এফ, এ, পাশ করে হুগলী কলেজে বি, এ, পড়তে যান তখন তাঁর মা তাঁকে বলে ছিলেন যে পরিশ্রম করবে; নম্র ও ধীর হবে; আর যখনই দেখবে যে আর সব ছেলেকে টপকে যাচ্ছ, তখনই মনে মনে নিজের আদর্শের সঙ্গে অবস্থাটাকে তুলনা করে নেবে।

কি করা যাবে

তা হ'লে আর অহঙ্কার তাঁর নাগাল পাবে না। প্রসন্নময়ী নামেও যেমন ছিলেন প্রসন্ন, কাজেও ছিলেন তেমনি প্রসন্ন। শোনা যায় একদিন তিনি ছেলেদের সত্যি সত্যিই নাকি প্রশ্ন করেছিলেন,—"হ্যাঁরে, অহঙ্কার কা'কে বলে, জানিস্" ?

বিদ্যাসাগরের মা ছিলেন সাহসিকতা, তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার মূর্তিমতী প্রতিমা। অল্প বয়সে মাতৃহারা রাসবিহারী মায়ের পুণ্যস্মৃতি জীবনে একটা দিনের জন্যেও ভুলতে পারেননি। মাকে হারালেও তিনি সকল সময়েই বলতেন যে এই সাধারণের মধ্যে থেকে তিনি যে অসাধারণত্বে পৌঁছে ছিলেন এটা এক মাত্র তাঁর মা পদ্মাবতীর কৃপায়। হেমচন্দ্রের মা আনন্দময়ীর পরদুঃখকাতরতাই পুত্রকে প্রাণপণে কবিত্ব প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে।

মা 'জাহ্নবীর' কাছ থেকে মধুসূদন পেয়েছিলেন কল্পনার ভাবাবেগ—মহাকবি হবার সাধ। 'সব চেয়ে বড় হব; আমার জোড়া কেউ থাকবে না'। এই খানেই বলে রাখা দরকার যে বাপের প্রভাবটাও সবটা ছেঁটে ফেলবার নয়। রাজনারায়ণের বংশে আর সব ছিল—বড় মানুষের ঘর, কেবল একটা জিনিস ছিল না—'আত্ম-সংযম'। 'যে জিনিস' থাকলে গরিবের ঘরেও শান্তি মেলে, অতি হীনও মহৎ হতে পারে সেই মানুষের প্রধান গুণ — 'আত্ম-সংযমে'র অভাব দত্তবংশে পর্যায়ানায় ছিল।

কি করা যাবে

মধুসূদনের বাপ, খুড়ো, জ্যাঠা কারুরই এ গুণটি ছিল না—যাঁর যা ভাল লাগতো তিনি তাই করতেন। অনেকে পয়সার অভাবে সংযমী হয়—এঁদের সে অভাব ছিল না—তাতে অজচ্ছল পয়সা—সুতরাং কেউ তা শেখেননি।

যে বংশের সবাই স্বেচ্ছাচারী সে বংশের আদরের দুলাল মধুসূদনই বা কেন আমোদ-প্রিয় অভিমানী, স্বেচ্ছাচারী, স্বাধীন-প্রকৃতি ও উচ্ছৃঙ্খল হবেন না? তাই মহাকবি হয়েও শৈশবের শিক্ষার দোষে- চরিত্র গড়ে না ওঠার দরুন—মধুসূদনকেও দীনের দীন – হীনের হীন হয়ে ভিক্ষুকের সঙ্গে – ভিক্ষুকের মত হাসপাতালে মরতে হয়।

এই দত্ত বংশেই কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাপের তরফের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত মেলে নইলে বাপের চেয়ে ছেলে মেয়েদের মা বেশী নিকটস্থ বলে এবং তার মমতা আরও গাঢ় ও নিঃস্বার্থ হওয়ায়—মায়ের প্রভাব প্রতিপত্তিই সন্তানের ওপর সব চেয়ে বেশী ও স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়।

মায়ের প্রেরণাই আমাদের জীবন যাত্রার প্রাণ স্বরূপ বলা চলে কেননা গর্ভধারিণীর মতন নাড়ার টানে কেউই আমাদের জন্মার্জিত প্রবৃত্তিগুলোকে সহানুভূতির চোখে দেখে না বা আমাদের শক্তি, অশক্তি, রুচি, অরুচির সঠিক খবর রাখে না। বাপের পক্ষেও এটা সম্ভবপর নয়।

কি করা যাবে

দেশপূজ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র একবার মায়ের জন্য একখানি ভাল লেপ কিনে দিয়ে ছিলেন। তাঁর মা কিন্তু সেটা গায়ে না দিয়ে একখানি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকতেন। হঠাৎ শীতকালে একদিন তিনি বাড়ি এসে দেখেন—মার গায়ে সেই ছেঁড়া কাঁথা! লেপখানির কথা মাকে জিজ্ঞাসা করায় জানলেন যে গ্রামের গরিব লোকেরা শীতে কষ্ট পাচ্ছে দেখে তিনি আর লেপ গায়ে দেন না। মায়ের মনের ভাব বুঝতে পেরে ঈশ্বরচন্দ্র পরদিনই দেড়শ' খানি মোটা কম্বল কিনে এনে মায়ের হাতে দেন।

মা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এমন আশীর্বাদ করে ছিলেন যার জন্য আজও লোকে ঈশ্বরচন্দ্রকে 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' বলে। বিদ্যাসাগর যখন তখন বলতেন,—'আমি এমন মায়ের ছেলে বলে গর্ব অনুভব করি'। গুরুদাসের মা ছিলেন কোমলে কঠোরে মিশ্রিত নিষ্ঠাবতী মেয়ে মানুষ। সেই জন্যই তিনি ছেলেকে কখনও বাইরের কোনও জিনিস এমন কি জলটুকু পর্যন্ত খেতে দিতেন না। মামার বাড়ীতে থাকলে পাছে ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় সেই জন্যে তিনি ছেলেকে নিজের কাছে নারিকেলডাঙ্গার কুঁড়েঘরে রেখে লেখা পড়া শেখান।

পার্শী পুরুতের ছেলে দাদাভাই নৌরোজীর মা একাধারে তাঁর মা-বাপ ও শিক্ষক সবই ছিলেন। দাদাভাই বলতেন যে তাঁর মা আলস্য যে কি জিনিস তা জানতেন না বলে তিনিও কখনও সেটার চেহারা দেখতে পাননি।

কি করা যাবে

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রে তাঁর বাপ-মা দুজনের প্রভাবেরই চমৎকার সমন্বয় দেখা যায়। যাদবচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী দুজনেরই ছেলের প্রতি ব্যবহার এমনই সুবিচার-সম্মত ছিল যে তারই জন্যে আজ পর্যান্ত বাংলাদেশ বঙ্কিমচন্দ্রের অমর কীর্ত্তিতে গৌরব বোধ করছে। ছেলের স্বাধীন চিন্তায় বাধা পায় এমন কোন কথা তাঁরা কখনও ভুলেও বলতেন না। অনেক কাল আগে তাঁদের জীবনদাতা মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদে যাজপুরের শ্মশান-ঘাটে যে কল্যাণ-বুদ্ধির অঙ্কুর প্রথম স্বামী স্ত্রীর মধ্যে উপ্ত হয়েছিল, সেটাই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে ফলে-ফুলে ছেয়ে তাঁকেও আত্ম-সচেতন করতে ছাড়েনি।

ভূদেবের মা তাঁর ছেলের সামনে যে সব উদাহরণ এনে খাড়া করতেন তার সৌন্দর্য্য ভূদেব কোন দিনই অস্বীকার করতে পারেননি। আশুতোষ তাঁর মায়ের শিক্ষা-দীক্ষার গুণে অল্প বয়স থেকেই কেমন যেন অপরের আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজের একটু স্বাতন্ত্র্য বোধ করতেন। মাতৃভক্ত ও মাতৃশিক্ষায় সতত সচেতন জানকীনাথও সব সময়েই মাতৃশিক্ষার মাহাত্ম্য কীর্তন করে বলতেন,—"একদিকে সমস্ত পৃথিবী, আর এক-দিকে আমার মা—তুলাদণ্ডে ওজন কর—দেখবে আমার মা ঝুঁকে পড়বে"। এই ত গেল মায়ের প্রভাব। এ ছাড়া বন্ধু বান্ধবের প্রভাবও বড় কম নয়। যে কোন লোকের বন্ধুকে দেখলেই বলা যায়—লোকটা কেমন।

কি করা যাবে

প্যারীচরণ গরিবের দুঃখ কষ্ট দূর করতে যে কতখানি সচেস্ট ছিলেন তা — তাঁর বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার যে দিন প্যারী বাবুর বাড়ীতে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় দিক্ষিত হন — সেই দিনই বুঝতে পারা যায় সেই দিনই মহেন্দ্র লাল সরকারকে দেখে প্যারী বাবু যে কেমন লোক সেটা আর কারুর বুঝতে বাকী ছিল না।

ভারতের অদ্বিতীয় মহাকবি কালিদাস যে দিন যক্ষরাজ অনুচরের মুখ দিয়ে তার বন্ধু মেঘকে ডেকে বলে ছিলেন,—

"তস্মিন্ কালে জলদ্ যদি সা লব্ধনিদ্রা সুখা স্যা-
দন্বাস্যৈনাং স্তনিত বিমুখো যাম মাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুত ভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্।"

সে দিন সেই অচেতন মেঘে দৌত্য ভারার্পণ এবং তার কাছ থেকে কোনও উত্তর প্রত্যাশা করা অনৈসর্গিক ব্যাপার জেনেও কি সুকৌশলে কবি তাদের বন্ধুত্বকে আরও সুগভীর ও পরিস্ফুট করে তোলেননি, যখন এই কথাটি বলে ;—

"কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিত মিদং বন্ধু কৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতোধীরতাং কল্পয়ামি"।

আমাদের মধ্যে যে সদ্‌গুণ গুলোর অভাব বোধ হবে—সেগুলো আমাদের নিতেই হবে বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ; নইলে আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা পবিত্র আদর্শের পূর্ণ বিকাশ একেবারেই অসম্ভব।

কি করা যাবে

বন্ধুর মত বন্ধু আমাদের চাইই চাই! তাই ভারত যুগ যুগ ধরে পেয়ে আসছে—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। এ না হ'লে হিন্দু বাঁচত না—হিন্দুর সমাজও থাকত না। নরেন্দ্রনাথ পাঁচ বছর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ পেয়ে কৃত-কৃতার্থ হয়ে ছিলেন। সেই পাঁচ বছরের সংসর্গেই তিনি সারা পৃথিবীকে অবাক করার মতন শক্তি সঞ্চয় করে ছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর সেই সিংহনাদ—"যেখানে চেষ্টা বা পুরুষাকার, যেখানে সংগ্রাম, সেখানেই জীবনের চিহ্ন—সেই খানেই চৈতন্যের বিকাশ" —এ কি কখনও বাঙ্গালী ভুলতে পারে—না পারবে?

কে মীমাংসা করবে যে নীলদর্পণ নাটকের লেখক দীনবন্ধু মিত্রের কাছে কালীপ্রসন্ন সিংহ কতটা ঋণী ছিলেন? পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুরা বলতেন, যে সেই দেবোপম লোকের সান্নিধ্যে একবার এসেছে, তার আর নিজেকে তারই পরিবারভুক্ত মনে করা ছাড়া উপায় ছিল না বা তার মন মেজাজেরও উন্নতি হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকত না।

তাঁর 'বেত খাওয়ার' গল্প শোনেনি এমন লোক বোধ হয় খুব অল্পই আছে। একদিন এক ভদ্র লোক তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে জিজ্ঞাসা করে বসলেন,—"মশাই, মুক্তি হয় কিসে"? বিদ্যাসাগর মশাই সে কথার কোন উত্তরই দিলেন না। ফের প্রশ্ন হ'ল; তখনও তিনি নিরুত্তর।

কি করা যাবে

তৃতীয় বার একই প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন,— "তুমি আমাকে বেত খাওয়াবে তবে ছাড়বে"। ভদ্রলোকটি অবাক হয়ে বললেন,—"সে কি মশাই! আপনাকে বেত খাওয়াব ?"

"তা না ত কি ? কিসে মুক্তি কিসে অমুক্তি তা নিজেই জানি না, তোমাকে কি বলব ? আমার মনে একটা বিশ্বাস আছে—হয় তো সেটা ভুল! আমি সে ভুল বিশ্বাস নিয়ে মরবার পর যমপুরী গেলুম—সেখানে চিত্রগুপ্ত আমার ভুল বিশ্বাসের কথা শুনে বললে—"বটে, তোমার এই বিশ্বাস ছিল ?' কে আছিস্‌রে লাগাত বুড়োকে পঁচিশ বেত"।

"তার পর আমি যখন নিজের বেতের জ্বালায় অস্থির—তখন হয়ত তুমি গিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'লে। চিত্রগুপ্ত তোমার বিশ্বাসের কথা শুনে জিজ্ঞাসা করবেই — এ মত তুমি কোথায় পেলে ? ব্যাস, তুমি আমাকে দেখিয়ে দিয়ে খালাস ! চিত্রগুপ্ত তখন আমাকে বলবে—বিট্‌লে বামুন নিজে ত মজেছ—আবার ওকেও নিজের মতে মজিয়েছ ? লাগাও বামুনকে আরও পঁচিশ ঘা" !

"বাপু, নিজের বেতের জ্বালায় অস্থির আবার তোমার পাল্লায় পড়ে যে তার উপর বেত খাব তা আর পারব না। কেন আর সাধ করে বুড়ো বয়সে মার খাওয়াবে ? একটা কথা জেনে রেখ যে যদি তুমি চিরকাল কাপড়ের কারবার করে থাক, তো বুড়ো বয়সে বেশ লাভ হবে শুনে চালের কারবারে হাত দিতে গেলে, লাভ ত দূরের কথা, লোকসান হবারই সম্ভাবনা।

কি করা যাবে

যা চিরকাল করে এসেছ — তাই কর। বুড়ো বয়সে মত বদলে লাভে মূলে যাবে কি" ?

কথায় বলে হিতৈষী বন্ধু সেই যে রক্ষা করবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করে। তাকে চটকরে যেমন চিনতে পারা যায় না—তেমনই তার সম্বন্ধে সতর্ক হওয়াটাও বাঞ্ছনীয়। আমরা শত্রুকে যেমন তফাত করব—বন্ধুকেও তেমনি সাবধানে টানব। আমরা যদি উপযুক্ত বন্ধু যোগাড় করতে পারি তবেই না আমাদের জীবনটা উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে ? আমাদের যাঁরা পথ দেখাবেন তাঁরা আদর্শ-স্থানীয় হওয়া উচিত নয় কি ? নইলে তাঁদের দেখাদেখি বড় হবার চেষ্টা করার মধ্যে গৌরবের পরিচয় কি রইল ? কবীর বলছেন

"অন্ধা গুরু অন্ধে চেলা,
দোনো নরকমে ঠেল্লাম ঠেলা"।

বন্ধুর প্রাণে বন্ধুর বিকাশ না হলে বন্ধুত্বই বৃথা। আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্যে যেমন ঘি, দুধ, মাছ, মাংসের দরকার তেমনি আমাদের আত্মার পুষ্টির জন্যে চাই বন্ধুবান্ধব। ডালডায় যেমন পুষ্টি সাধন হয় না, আলাপেতে তেমনি হিতৈষা জাগে না। মধুসূদনের গৃহশিক্ষায় ত্রুটি থাকলেও সেটার সংশোধন হয়েছিল ভূদেবের সঙ্গে বন্ধুত্বয়। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্রের বিপন্ন আত্মীয়-বর্গের অবস্থা কি দাঁড়াত যদি না তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু গিরিশ ঘোষ তাঁর দেনার টাকা মিটিয়ে দিতেন।

কি করা যাবে

রাজা রামমোহন রায়ের কি হ'ত যদি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর না থাক্‌তেন ? ভূদেব মুখুজ্যের জামাই বামাচরণ না থাকলে কবি হেমচন্দ্রেরই বা অবস্থা কি দাঁড়াত ?

বন্ধুর শিক্ষা ও আচরণে মানুষের জীবনটা যে কি ভাবে গড়ে ওঠে তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রমেশচন্দ্রের বুড়ো ভৃত্যবন্ধু যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে খবর রাখলেই টের পাওয়া যায়। ঈশানচন্দ্র তখন কুমারখালিতে ডেপুটি কালেক্‌টার। ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ি, ভেতরে স্থানাভাব বলে যোগেশ ও রমেশ দুই ভাই বাইরের ঘরে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে থাকে ও শোয়। বৃদ্ধ যুধিষ্ঠিরই ছেলে দুটির অভিভাবক বললেই চলে। বাপ মার দিক থেকে যদি বা কোনও ত্রুটি হয়, কিন্তু কি স্নেহ, কি যত্ন, কি শাসন, কি তদারক, ছেলেদের সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের দিক থেকে এক চুল ত্রুটি হবার উপায় নেই। যুধিষ্ঠির তাদের চাকর—খেলার সাথী আবার গুরুমশাই—একাধারে সব।

বালক রমেশচন্দ্র ছোট থেকেই ভয়ানক চঞ্চল—স্থির হয়ে এক যায়গায় থাকতে পারে না—সর্বদা ছুটোছুটি হুটোপাটি নিয়েই আছে। এদিকে খুব মেধাবী বলে অতি অল্পক্ষণ বই নাড়াচাড়া করলেই তার পড়া হয়ে যায়। একবার কুমারখালি স্কুল ছেড়ে এসে বহরমপুর স্কুলে ভরতি হওয়ার পর কি জানি কেন রমেশচন্দ্রের পরীক্ষার ফল ঠিক আশানুরূপ না হওয়ার দরুন যুধিষ্ঠিরের ধারণা হয় যে রমেশ নিশ্চয়ই পড়াশুনায় ফাঁকি দিচ্ছে।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে একদিন যখন যোগেশ ও রমেশ দুই জনেই শয্যায় শুয়ে, যুধিষ্ঠির তখন ঘুম থেকে উঠে রমেশকে মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে বল্লে,—"অন্য ছেলেরা যে সব পড়া ঢের বেশীক্ষণ ধরে পড়ে তৈরী করতে পারে না, তোমার সেটা এক-মিনিটে কি করে তৈরী হয়, আমি তো তা বুঝতে পারি না। তুমি নিশ্চয়ই ফাঁকি দাও। এমন করলে আমি আর তোমাদের সঙ্গে খেলবও না রামায়ণ পড়েও শোনাব না। তোমরা যদি ভাল করে লেখাপড়া না কর আমি আর এ বাড়ীতে থাকব না—বাবুকে বলে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাব"।

পরিণত বয়সে রমেশচন্দ্র বলতেন যে যুধিষ্ঠিরের এই মৃদু অথচ গুরুগম্ভীর ভর্ৎসনার ফল তাঁর পক্ষে বড়ই মধুময় হয়েছিল; পারনা স্কুলের পরীক্ষায় তিনি সকলের উপরে হয়ে সকলকে —অবাক করে— এক গাদা প্রাইজ নিয়ে বাড়িতে এসে ছিলেন বটে—কিন্তু যুধিষ্ঠির তখন পৃথিবী থেকে জন্মের মত বিদায় নিয়ে চলে গেছে—তাকে ডেকে এনে দেখাবার আর কোনও উপায়ই ছিল না। সে তখন দুরন্ত ও চঞ্চল রমেশচন্দ্রের নাগালের বাইরে। আদর্শের এই যে প্রেরণা, এটা উদার স্বভাব যারা, তাদের চরিত্রে অভূতপূর্ব্ব কাজ করে এবং করে বলেই আমাদের কবি, শিল্পী বা স্বদেশহিতৈষী মাত্রেই তাঁদের জীবন ধারার মধ্যে যেটুকু উৎকৃষ্ট যে-টুকু মহৎ সেটুকুর ইঙ্গিত তরুণ প্রাণে জাগিয়ে দিয়ে মনুষ্য সমাজের যে কত বড় কল্যাণ নির্বিকারে করে যাচ্ছেন, তার তুলনা হয় না।

কি করা যাবে

ভারতচন্দ্র তাঁর কথার চাবুকখানি দিয়ে গেলেন দাশুরায়ের হাতে; ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মর্মঘাতী আর্তনাদের মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বামী সত্যানন্দ গেয়ে উঠলেন—"বন্দেমাতরম্" ! হেমচন্দ্র না থাকলে নবীনচন্দ্রকে পাওয়া যেত কি ? কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ যদি বিহারীলালের গানে আত্মহারা না হতেন তবে কখনই তাঁর মুখে ধ্বনিত হত না — 'সার্থক জনম আমার তোমায় ভালবেসে'।

কে অস্বীকার করবে যে মহাত্মা গান্ধীই শেষ পর্যন্ত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের চরকা মন্ত্রের দীক্ষাদাতা ? আর কেই বা জানে না যে আলামোহন দাসের উৎসাহদাতা এই বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা ভিন্ন কেউ নয় ? বিদ্যাসাগরের পায়ের তলায় বসে যিনি বাঙ্গলার গোড়া পত্তন করেন তিনি আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র ন'ন কি?

শ্রদ্ধাপুত মনে যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে গল্প-উপন্যাসের ধুনিটি নিয়ে সেটিকে প্রজ্বলিত করে রেখে গিয়ে থাকেন তো বাঙ্গালীর শরচ্চন্দ্র ভিন্ন আর কে ? শরচ্চন্দ্রের প্রাণের ডাকে শুধু বিনোদই সাড়া দেয়নি—সাড়া দিয়েছি আমরাও। সাড়া দিয়েছে সমস্ত বিশ্ববাসী—সাড়া দিয়েছে তাঁর প্রত্যেকটি দরদী বন্ধু। লোকমান্য তিলক যে দিন নৃসিংহ চিন্তামণি-কেলকারকে ওকালতি ছাড়িয়ে এনে মারহাট্টার উপযুক্ত সম্পাদক সাব্যস্ত করে পত্র দেন—তাতে কি লেখা ছিল ?

সে পত্রে লেখা ছিল না কি ?—"আমি আপনাকে চাকর রাখবার জন্যে ডাক্‌ছি না—আমি আপনাকে আমার সহকারী মিত্রপদে প্রতিষ্ঠা করলুম"। কেলকার এই প্রথম তিলকের সংস্পর্শে এলেও এই সংসর্গের দরুন বহু সদ্‌গুণের অধিকারী হন। এই বন্ধুত্বই কাবুলের লোককেও অনুপ্রাণিত করে, তাদের রাজস্ব মন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নিরঞ্জন দাসকে সভাপতি করে তিলকের মৃত্যুশোক প্রকাশ করতে।

রাণাডের সঙ্গে বন্ধুত্বই গোখেলের প্রাণে প্রাণে শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করে ছিল এবং সেই সৌহার্দ্যের বিকাশই রাজনীতিবিদ গোখেলেরই বিকাশ। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সেই ষোল বছরের বাঙ্গালী শুশ্রূষাকারিণী তরুণী বেলা দত্তের আত্মাপুরুষ আহতদের করুণ আর্তনাদের মধ্যেও যে মাভৈঃ মাভৈঃ রব তুলে ছিল সে কি কেউ ভুলতে পারে ?

আমরা লাখ কথায় যা শিখতে পারি না একটা সামান্য দৃষ্টান্ত থেকে তার চেয়ে ঢের বেশী শিখতে পারি। নীতি কথা রাস্তা বাতলাতে পারে বটে, কিন্তু অমন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারে না। উপদেশ যতই সারগর্ভ হোক না কেন এর সঙ্গে উদাহরণের যোজনা না থাকলে আমাদের প্রাণটা সাড়া দিতে চায় না। সেই জন্যেই বাগ্মী সুরেন বাঁড়ুজ্যে যখন বলতেন—"আমি যা বলি তা কর, আমি যা করি তা কোরো না"—তখন সে কথায় কেউ সাড়া দিত না।

কি করা যাবে

সত্যিই যদি আমরা বড় হতে চাই, আমাদের চোখের সামনে বড় বড় আদর্শ তুলে ধরতে হবে—আমাদের বন্ধুবান্ধবকেও বেশ ভাল করে বাছাই করে নিতে হবে। নইলে আমরা জানতেও পারব না বুঝতেও পারব না তারা আমাদের কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে। ঐ টানাটানির মুখেই আমাদের সতর্ক হতে হবে—যাতে তারা আমাদের ওপরে টেনে তোলে—নীচে টেনে না নামাতে পারে।

ভাল মন্দর কোনটাই একেবারে নিঃসঙ্গ একলাটি থাকতে পারে না। ভাল খোঁজে ভাল সঙ্গ; মন্দ খোঁজে মন্দ সঙ্গ। সম্বন্ধহীন সম্পর্ক যেমন কল্পনাতীত, তেমনি আবার খারাপ সঙ্গীর সান্নিধ্যে এসে আমরাও বন্ধুবান্ধবের কি করে উপকারে আসতে পারি এটাও ধারণাতীত। আমাদের চরিত্রে যে তড়িৎপ্রবাহ খেলছে সেটার তো আর বিরাম নেই। একমাত্র নিয়ামক যন্ত্র ছাড়া তাকে নিয়ন্ত্রিত করবে কিসে? তাই প্রয়োজন সৎসঙ্গের ও সৎদৃষ্টান্তের—যারা চোখও রাঙ্গাবে এবং পথও দেখাবে—তাড়িয়েও দেবে আবার ডেকেও নেবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূরবীতে বন্ধুত্বের যে উন্নত অথচ সত্য ও সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তা যথার্থই সত্যেন দত্তের উপযুক্ত। তাঁর সে করুণ স্মৃতির ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্ছনা আজও যেন ঝংকৃত হচ্ছে—:

"জানি তুমি প্রাণ খুলি

কি করা যাবে

এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্যনব সংগীতের হারে।
অন্যায়, অসত্য যত, যত-কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রুর, তার'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম—
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম,
করুণ কোমল। তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী'-পরে
একটি অপূর্ব্ব তন্ত্র এসে ছিলে পরাবার তরে
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আসল সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গন তলে
বর্ষা বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখার
আলিম্পন; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়েছ সংগীত তব; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেছ আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রাদল রুদ্ধদার রাত্রি-অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি
জয়মাল্য বিরচিয়া—রেখে গেলে গানের পাথেয়

কি করা যাবে

বহ্নিতেজে পূর্ণ করি ; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি ॥"

যে শত সহস্র কারণ আমাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সন্ধানে এগিয়ে নিয়ে চলেছে — কোন রকমের আকস্মিক ব্যাপারকেও তাদের মধ্যে একটা বলা চলে। হঠাৎ একদিন এক উপনিষদের ছেঁড়া পাতা কুড়িয়ে পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তা বলে আমরা সবাই তো আর সেই ছেঁড়া পাতা কুড়িয়ে পাবার সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনতে পারি না বা সেই ভাবের ঘরের কাঙাল হয়ে সমস্ত জীবনটা অনর্থক অপচয় করতে পারি না।

আমাদের সবাইএর বৃত্তিটা কিছু অসাধারণ বা অলৌকিক হওয়া সম্ভব নয়—উচিতও নয়। বিনম্র, সাধারণ ও নাতিশীতোষ্ণ হওয়াই ভাল। আমাদের বৃত্তিটা সৎ হলে এবং আমাদের কর্তব্যে নিষ্ঠা থাকলে—কাজটা যদি আমাদের সাধ্যাতীত বা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ না হয়—তা হলে অনুশোচনা করবার কি থাকতে পারে? আমাদের কর্মক্ষমতাকে ঘিরে যে কর্মক্ষেত্র গড়ে আছে তারই মধ্যে কায়মনোবাক্যে একজন কর্মকারী হবার শপথ গ্রহণ করতে পারলেই যথেষ্ট হবে। যা-কেন আমাদের উদ্দেশ্য হোক না—সেটি হওয়া চাই সাধু এবং সেটাকে করতে হবে অকপটে।

কি করা যাবে

আমরা কোন পথে যাব এটা প্রথমটা একটা সমস্যা বোধ হলেও শেষ পর্য্যন্ত পথ মিলবেই মিলবে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—"সময় না হলে কিছুই হয় না। সংসার কর্ম্মভূমি। কর্ম্ম করতে করতে তবে জ্ঞান হয়; কর্ম্ম করতে করতে তবে মনের ময়লা কেটে যায়। ঈশ্বরে শরণাগত হলে কর্ম ক্ষয় হয়। বিচিটা পুতলেই কি অমনি ফল পাওয়া যায়? আগে অঙ্কুর হবে, তারপর চারা গাছ হবে তারপর সে গাছ বড় হ'য়ে তাতে ফুল ধরবে—তারপর ফল। তবে লেগে থাকতে হবে, ছাড়লে হবে না"।

গিরিশচন্দ্র খুব ভাল গান বাঁধতে পারতেন—শুধু গান বাঁধা নয়, নিজে ভাল অভিনয়ও করতে পারতেন। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট শক্তি থাকলেও তিনি মনে মনে নটের বৃত্তিকে ঘৃণা করতেন। তাই তাঁর অভিনয়ের মধ্যে আমরা কোথাও নাট্যাচার্য্যকে দেখতে পেতাম না—দেখতে পেতাম সাধকের তীব্র ব্যাকুলতা—দেখতে পেতাম ভক্ত বিল্বমঙ্গলের মুখে তাঁরই প্রেমনায়িকা নটীকে বলতে—"কি করে ঈশ্বরে অনুরাগ করতে হয়, তা তুমিই আমাকে শিখিয়েছ"। আর এই অভিনয়ের মধ্যেও উপাসনার ধ্যানেই গিরিশচন্দ্রের স্থান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে। তাই আবার বলছি আমরা যা করি না কেন সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে একটা কাজ ধরলে আর তাকে ছাড়া হবে না—জোঁকের মতন সেটাতে লেগে থাকতে হ'বে কায়মনোবাক্যে।

কি করা যাবে

কোন কিছু মুখরোচক নয় বলেই যে বর্জনীয় এটা মনে করলে ভুল হবে না কি? পায়ে কাঁটা ফুটলেই যে পথে পা দেব না এটা কি প্রতিভার পরিচয়? আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে বলতেই হবে—

"হোক্‌নারে পথ অসমতল, নাই বা গেল দেখতে পাওয়া,
নাই বা হোল আমোদজনক, কঠিন না হয় চলই যাওয়া!
তবুও সেই পথের 'পরে
চলনা সবাই সাহস করে
ও ভাই ওরে
দেখ্‌না কিছু থাকেই সেথা থাকেই যদি ডর—
ওরে ঐ থাকেই যদি ডর
শুধু কর ঈশ্বরেতেই ভর!
শুধু কর ঈশ্বরেতেই ভর!!"

যৌবনের চঞ্চলতার দরুন আমরা এটা ছেড়ে ওটা, ওটা ছেড়ে সেটা করার ফলে কোনটাতেই সফলতা লাভ করতে পারি না। সুতরাং সতর্ক হয়ে আমাদের পথ ধরতে হবে—যাত্রার পর পথ যেন আমাদের ঠকাতে না পারে। কিন্তু পথের দূরত্ব দেখে আমরা যেন পিছু না হটি। এ করলে গন্তব্য স্থলে আমরা পৌঁছুতেই পারব না। মনে রাখতে হবে প্রতিভার কাছে পথ অনেক আর তার কোনটাই দুরতিক্রম্য নয়—কিন্তু যারা সাধারণ শক্তির অধিকারী তাদের কাছে দুর্লঙ্ঘ্য তো বটেই অধিকন্তু বিপজ্জনকও কম নয়।

তা বলে নিজেকে হীন বা দুর্ব্বল মনে করবারও কিছু নেই। আমরা নিজের মধ্যের নিজকে একবার প্রাণ ভরে ডাকি দেখি কেমন সাড়া না পাওয়া যায়। যাই আমাদের অবলম্বন হ'ক না কেন, তাকে ঘৃণা করবার কি আছে? হীন হলেও সেটাকে সাধনা ও সাধুতার মারফত যথাসাধ্য চেষ্টাকরে উঁচু করে তুলতে হবে। কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা বা জোচ্চোরিতে খ্যাতি প্রতিপত্তি হয় না। যেন মনে থাকে নিঃস্বার্থভাবে ও অকপটে যে-কোন কাজ করে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে কাজ মানুষকে বড় করে না—মানুষই কাজকে বড় করে।

উৎসাহ, ধৈর্য্য ও নিশ্চিত-বিশ্বাস নিয়ে কর্ত্তব্যের মধ্যে ঝাঁপ দিতে হবে আর নলিনীকান্তের হৃদয়, মন, চিন্ত—এমন কি নিজের সর্ব্বস্ব নিয়ে বলতে হবে—"জগজ্জননীতে আমার প্রয়োজন নেই, আমি শুধু আমার সুধাংশুবালাকেই চাই"। লোকে হাসবে? হাসুক! ঘৃণা করবে? করুক! মনস্কাম সিদ্ধ হবার ব্যাকুলতা নিয়ে ভক্ত তুলসীদাসের মত আমরাও যেন বলতে পারি——

"হস্তি চলে বাজার মে
কুত্তা ভুখে হাজার।
সাধুনকো দুর্ভাব নহি
যাঁও নিন্দে সংসার॥"

-ঃ ✿ ঃ——

কি করা যাবে ?

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে

তিন

মানুষের আচরণের ওপর যদি কোথাও নির্মম কশাঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠে থাকে, তবে সেটা সত্যিই উঠেছে ঋষির তিরস্কারের ভেতরে দিয়ে—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। কথা কটা যেন সত্যিই সুযোগের অপব্যয়ের, শক্তির অপচয়ের আর এই বরবাদ জীবনের নরক ভোগের ছবিটাকে প্রকট করে তুলে ধরেছে। করুণ হলেও এর যথার্থ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় আমাদের মাইকেল মধুসূদনের চরিত্রে।

স্বভাবের অত শোভা বোধ হয় আর কারুর মধ্যেই ছিল না। অত বড় স্বভাবসিদ্ধ সৃজন শক্তি, অত রকম মানসিক সঙ্গতির প্রাচুর্য্য দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হবে না। মাষ্টার হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি, কাগজের সম্পাদক হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি; মস্ত কবি হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি, আবার ব্যারিষ্টার হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি কোনটাই ফেলবার নয়।

কি করা যাবে

যে মিথ্যাকে সত্যি করবার জন্যে বক্তৃতার চোটে আদালত ঘর সরগরম করবে সেই মানুষই আবার কেমন করে সৌন্দর্য্যে বিভোর হয়ে মহাকাব্য রচণা করবে, এ যেন ভাবতেও পারা যায় না। কিন্তু মধুসূদন তাও করেছিলেন; দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ব্যারিষ্টার মধুসূদনের পসার হ'তে দেরী হয়নি।

প্রথম বছর থেকেই ফি মাসে তাঁর এক হাজার—দেড় হাজার টাকা রোজগার হতে থাকে। আবার মস্ত পণ্ডিত—মস্ত বিদ্বান —মস্ত কবি বলেও দেশের লোকের কাছে তাঁর সুখ্যাতি ধরত না। এগুলো সাফল্যের পরিচায়ক বটে; মধুসূদনও যে কতকটা সফলতা লাভ করেছিলেন, এটাও ঠিক। তবে তাঁর পড়তা ক্রমান্বয়ে বদলে যেত; এই যা।

পর পর অনেক কিছুই তিনি করেছেন কিন্তু কোনটাই স্থায়ী ভাবে নয়—তাঁর সে অদম্য শক্তি যেটা একটা বা দু'টো জিনিসের জন্য সঞ্চিত রাখা উচিত ছিল, সেটা নানা চেষ্টায় ব্যয়িত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে বিরাট পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে—তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে তাঁর অকৃতকার্য্যতা—তাঁর নিষ্ফলতা। এটা কম দুঃখের কথা নয়! শেষ জীবনেও যে মধুসূদন মাতৃভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করে, বাংলার সাহিত্য ভাণ্ডারে "মেঘনাদ বধের" মতন মহাকাব্য দান করে অক্ষয় কীর্তি অর্জ্জন করে ছিলেন—সে যশের কতটুকুই বা তিনি পেয়ে গেছেন তাঁর জীবদ্দশায়? তাঁর জীবিত কালেই কি তাঁর মৃত্যু হয়নি?

কি করা যাবে

বাঙালী যদি তাঁকে ভুলেই না যাবে, তবে তাঁর হাঁসপাতালে মৃত্যুই বা হবে কেন? যে দোষে তিনি জীবন্মৃত হয়ে ছিলেন —ঠিক সেই অপরাধেই আজ আমরাও জ্যান্তে মরতে বসেছি।

একটা ছোট ছেলেও সূর্য্যের আলোতে আয়না ধরে সেই রশ্মিটার তীব্র কিরণকেন্দ্র নিয়ে অদূরবর্ত্তী লোকের মুখে ফেলে যে আনন্দ পায়—সে আনন্দও আজ আমরা সবাই পাই কি? বাঙ্গালী কি আজ একীকরণের আদর জানে; না বোঝে? তার কাছে একত্র করা, আর একাকার হওয়া দু'টো এক হয়ে ওঠেনি কি? স্কুলের ছেলেতে যা বোঝে আমরা গোটা জাতটাও তা বুঝি না—এমনই আহাম্মক আমরা! মধুসূদনের মত আমাদের গোটা প্রতিভাটাকে আমরাও ছড়িয়ে চলেছি অনেক কিছুর অন্বেষণে।

তাই আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে ৺গৌরদাস বসাকের মতন একজন যথার্থ বন্ধুর—যে জোর গলায় বলতে পারবে- মধুর কাছেও অমন রূপকথার অনেক পরীদের যাতায়ত ছিল—এমন কি বীণাপাণিও খুব শৈশব থেকেই আসতেন—কিন্তু ঐ যে একটা দুষ্টু সরস্বতী তার কাঁধে ভর করে ছিল তারই পাল্লায় পড়ে তাঁকেও পথ দেখাতে হয়—কেননা সে বেজায় বে-আড়া। বেআক্কেলকে ধরে রাখা যায় কি?

আমাদের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

কি করা যাবে

আজকের যুগে যার ক্ষমতা ও সাধনা মুখ্য হয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করবে সে কিনা গৌণ হয়ে রইল মাত্র দৃঢ়তার অভাবে। সারা বাংলা দেশ আজ যার সোনার মূর্ত্তি গড়িয়ে দেবতার মতন পূজো করবে, সে কিনা ভিখিরির মত দুনিয়ার লোককে ডেকে বলছে—

"দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে"......

কেন এ যাচঞা?

উদ্দেশ্যকে এক কেন্দ্রীভূত করার অভাবে নয় কি? তাঁর সঙ্কল্পের মধ্যে দৃঢ়তা কোথায়? উদ্দেশ্যে অটল অচল হলে কি সে মানুষের চরিত্র গড়ে উঠতে বাকী থাকে? কখনই নয়! আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে যে আমাদের উদ্দেশ্য সুবিচার-সম্মত বা যথার্থ কি না। তারপর সেটা স্থির হলে, তবেই সেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্কল্প নিয়ে আর আমাদের এক পাও হটা চলবে না। মনে রাখতে হবে পথ বা কর্তব্য থেকে চ্যুতি—এ আত্মহত্যারই সমান। টিকে না থাকলে যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে কিসে? উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে কেউ কি কখনও জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়েছে? লেগে থাকা চাইই চাই!

আমাদের মনে পড়ে, তবলা শিখতে কতদিন লাগে, এই প্রশ্ন কোনও এক সময়ে মৃদঙ্গবাদক নগেন মুখুজ্জেকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়ে ছিলেন যে দিন বার ঘণ্টা করে একাদিক্রমে বিশ বৎসর সাধনার দরকার। হা অদৃষ্ট!

কি করা যাবে

আমরা মনে করি উদ্দীপনার বশে বুঝিবা একবার "তেরে কেটে তাক" করেই শিখে ফেলবো। নগেন মুখুজ্যে যে এত বড় পাখোয়াজ বাজিয়ে হয়ে ছিলেন তা কেবল তবলায় রোজ বার ঘণ্টা অভ্যাস করার দরুন। বিনা আয়াসে কিছু হবার যো আছে কি? তাঁর ইষ্টমন্ত্রই ছিল 'পরিপূর্ণতা'; এবং যারা সত্যি সত্যিই যথাযথ শেখবার জন্যে ব্যগ্র আমাদের মতে তাদের 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হব' এই মন্ত্রই জপমালা হওয়া উচিত।

কায়মনঃপ্রাণে সবই করতে হবে বটে—কিন্তু সেটা পাঁচটা নিয়ে নয়—একটা নিয়ে—নইলে সুখের আশা ছাড়তে হবে। একটাতে লেগে থাকা চাই—তা সে বিড়ি বাঁধা, বিড়ি বাঁধাই সই। কালে হয় তো তাই থেকেই দেশী চুরুটের প্রকাণ্ড কারবার গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এক সঙ্গে বিড়ির দোকান, সাবানের কারখানা ও আটার কল চালাতে যাওয়ার মানেই দেউলের খাতায় নাম লেখান নয় কি? যদিও আমরা বুঝি যে আমাদের উদ্দেশ্য বা চেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করাটা যতটা সহজ মনে করা যায় ততটা সহজ নয়—তবুও এটা ঠিক যে নানানটা নিয়ে উৎসন্নে যাওয়ার চেয়ে একটা নিয়ে উন্নতি করা বরং ভাল।

আমাদের অবলম্বিত বৃত্তি যেটাকে আশ্রয় করে আমরা অগ্রসর হব সেটার জন্যে যে কি বিরাট অধ্যবসায় বা দৃঢ়তার আবশ্যক তার কিছুটা আভাস আমাদের স্যার রাজেন মুখুজ্যের বনিক্ জীবনের প্রথম পা বাড়ানর মধ্যেই পাওয়া যায়।

কি করা যাবে

এ গল্প তাঁর মুখ থেকেই আমাদের শোনা। একদিন কোন এক কার্যগতিকে ঘোরাঘুরি করতে করতে তিনি ক্লাইভ ষ্ট্রীটের একটা মস্তবড় আপিসে হঠাৎ যেন নিজের শক্তির প্রভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই ঢুকে পড়লেন। তিনি এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন বটে কিন্তু তাঁর দিকে কেউ ফিরেও চাইলে না।

কয়েকটি যুবক তখন সেখানে বসে বসে নক্‌সা কাটছিল, কয়েক জন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার পর শেষে আর থাক্‌তে না পেরে উপস্থিত একজন ইওরোপীয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—"মশাই, আপনাদের কি কোনও ঠিকাদারের প্রয়োজন আছে"?

তৎক্ষণাৎ সোজা ভাষায় উত্তর হ'ল,—"তোমাকে কে বললে আমাদের ঠিকাদারের প্রয়োজন"? রাজেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন —"আমাকে একথা কেউ বলেনি সত্য, তবে আমি মাত্র কিছুদিন হ'ল পূর্ত্তবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ঠিকাদারি করছি, এবং আমায় এখন কিছু উপার্জ্জন করতে হবে। বাড়ীতে আমার মা আছেন এবং তিনি আমাকে বসে খাওয়াতে অপারক।"

রাজেন্দ্রনাথের বলার ভঙ্গী বা আবেদনের যুক্তির যে কোন একটার প্রভাবেই মিনিট পাঁচ সাত বাদে তাঁর ডাক পড়লো কর্মকর্ত্তাদের ঘরে। তাঁদের সেই খাসকামরায় প্রবেশ করেই তিনি দেখতে পেলেন একটি টেবিল ঘিরে ত্রিমূর্ত্তি বিরাজ করছেন—যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।

কি করা যাবে

অভিবাদন করা মাত্রেই তাঁকে আবার সেই পুরনো প্রশ্ন করা হ'ল। তিনি দেখলেন এবার প্রশ্নকারী কিছু অল্প বয়স্ক হলেও একজন ব্যবসায়ী কর্মকর্তা। তাঁর একধারে একজন তপ্তকাঞ্চনবর্ণ কমনীয় প্রৌঢ় আর এক ধারে একজন যুবা —উভয়েই কারবারে অংশীদার। রাজেন্দ্রনাথ এবারেও সেই একই উত্তর দিলেন তবে সেটুকু বেশীর ভাগ বললেন তার সার-মর্ম এই যে তিনি রোজগার করতে পারলে পরের কাছে হাত পাততে একেবারেই অনিচ্ছুক।

তাঁর সঙ্কল্প যে সত্যিই কর্মকর্তাদের প্রশস্তি পেয়েছিল তা বুঝতে আর বাকী ছিল না কেননা পরদিন থেকেই তিনি ঐ অতবড় মার্টিন কোম্পানিতে নিযুক্ত হয়ে ছিলেন। যদিও বেতন সাধারণ বলেই তখন তাঁর মনে হয়ে ছিল কিন্তু তাতেও তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছিলেন -যেহেতু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। যে আপিসে আগের দিন তিনি একজন আগন্তুক মাত্র, সেই আপিসেই পরদিন সকালে তিনি একজন কর্মচারী —এ বড় কম কথা নয়!

স্বীকার করতেই হবে যে স্যার রাজেন্দ্রনাথের লক্ষ্য বিষয়ে সাক্ষাৎ সন্ধান, তাঁর নির্ভীকতা, তাঁর কর্মশক্তি এ সবগুলোই তাঁর সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির উপযুক্ত, কিন্তু তা বলে এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেই যে সবাই কৃতকার্য হবে এটাও ত বলা চলে না বা এটা সম্ভবও নয়।

কি করা যাবে

আমাদের নিতে হবে এর নৈতিক দিকটা অর্থাৎ আমাদের নিজেদের মনটাকে চিনতে হবে এবং তাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। হয় তো আমরা সম্পূর্ণ জয়যুক্ত নাও হতে পারি—কেননা আমাদের সাংসারিক বা আর্থিক অবস্থা সব সময়ই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেই — তবুও এটা ঠিক যে লেগে থাকলে আমাদের পূর্ণমাত্রায় পরাজয়ের গ্লানি কখনই বইতে হবে না। যুদ্ধের নৈপুণ্যই তো নির্ভর করে সেনাপতির আক্রমনের বৈশিষ্ট্যের ওপর আর তার নাছোড়বান্দা চেষ্টায়।

মানুষ মাত্রেই তো চকমকি পাথর। তাতে ঠোকা দিলে তবে না চিকমিক করে আগুনের ফুল্‌কি বেরুবে। সুতরাং এটাতে কোনও বিরোধ বা মতভেদ থাকতে পারে না যে প্রত্যেক বড় লোকই বড় হয়েছে, প্রত্যেক কৃতকৃত্য লোকই সিদ্ধিলাভ করেছে —তবে যে যতটা পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট পথে তার কর্ম-শক্তিকে সীমাবদ্ধ করতে পেরেছে—সে ততটা সাফল্য লাভ করতে পেরেছে কম ঠোকাঠুকিতে। জাঁদরেল কালু বলতে আমরা যেমন জেনারেল কালী চরণ ঘোষকেই বুঝি ; চরক ঋষি বলতে যেমন সেই প্রসিদ্ধ বৈদ্যক শাস্ত্রকারকেই বুঝি ; তেমন শুভঙ্কর বলতেও বুঝি সেই বিখ্যাত বাঙ্গালী গণিতজ্ঞকে। কারণ এঁরা যে যা নিয়ে কারবার করেছেন তাঁর সেই পণ্য চিহ্নটাই তাঁকে আমাদের কাছে চিহ্নিত করে রেখেছে।

কি করা যাবে

এটা সত্যি যে বরিশালের গোবিন্দ চন্দ্র রায় একাধারে প্রচারক, ডাক্তার ও কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁর গানের মধ্যে অমূল্য গান, 'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী যমুনে ও' এবং 'কতকাল পরে বল ভারত রে' যে দু'খানি গান যথার্থই তাঁকে যশস্বী করেছে, তা আজ ক'জন বাঙ্গালী জানে। আমাদের প্রতিভাকে যদি আমরা ছড়িয়ে ফেলি তা হলে সেটা দুর্ব্বল হয়ে পড়বেই।

তার বিস্তার হবে বটে কিন্তু গম্ভীরতা বলে জিনিসটা থাকবে না। সার্ব্বত্রিকতা একটা ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়— ওটা আমাদের আশাপ্রদ মনকে ধ্বংসই করছে। পঞ্চাশটা জিনিস একসঙ্গে শেখা মানে কোনওটাকেই ভাল করে না শেখা। আমরা নানা বিষয়ে যদি পারদর্শী হতে যাই তা হলে আমাদের সকল জ্ঞানই ভাসা ভাসা হতে বাধ্য। কথায় বলে, সাত সতীনের ঘরকন্না, বাড়ীর গিন্নী ভাত পান না।

হুগলী বাঁশবেড়ের প্রসিদ্ধ শ্রীধর কথক যৌবনে জেঠা-মশায়ের ভৎসনায় এক বন্ধুর সঙ্গে মুর্শিদাবাদে গিয়ে সেখানে ব্যবসা সুরু করেন। কিন্তু সে কাজ তাঁর ভাল না লাগায় সেটা ছেড়ে দিয়ে এসে বহরমপুরের কালী চরণ ভট্চার্জির কাছে কথকতা শিখে শেষে সেই কাজেই প্রসিদ্ধি লাভ করে ছিলেন।

কি করা যাবে

তিনি বলতেন যে যাকে পাঁচালী ও কবি গাইতে হবে তার মুখ বুজে থাকা চলে না কেননা ভাল মানুষটির মতন চুপ করে পুরাণ পাঠ করলে তো আর কথকতা হয় না—এ'দুটো যে এক সঙ্গে চলাই অসম্ভব। গান গেয়ে ভাবভঙ্গী করে না দেখালে কথকতা কোথায় হ'ল? অমন কথক ঠাকুরকে কে চায়?

হাওড়ার তন্ত্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে শোনা যায় যে তিনি যা কিছু করতেন দেহ মন ঢেলে দিয়েই করতেন। তিনি যেটাতে হাত দিতেন সেটাতেই আত্মজ্ঞানহারা হয়ে ডুবে থাকতেন। তিনি কখনও এমন কিছুতে হাত দিতেন না যেটাকে ব্রত বলে গ্রহণ করতেন না। তাই আজও তাঁর কোন কাজেরই মূল্য হ্রাস হয়নি—আজও ভারত জুড়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বত্রিশটি কালীবাড়ী বিদেশী বাঙ্গালীর আশ্রয়স্থল হয়ে—তাঁরই চেষ্টার তাঁরই তপস্যার সাক্ষি দিচ্ছে।

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার যে সব দৃষ্টান্ত সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে তার অধিকাংশই অনুসন্ধানের ফলে ভ্রান্ত বলেই প্রতিপন্ন হবে। উদাহরণ স্বরূপ স্যার আশুতোষের কথাই ধরা যাক। সত্যিই তিনি গণিতের দিক দিয়ে, ভাষার দিক দিয়ে, আইনের দিক দিয়ে খুবই ব্যুৎপত্তি লাভ করে ছিলেন সন্দেহ নেই। এ সব বিষয়ে তাঁর দানও অসীম।

এ ছাড়া কলকাতা য়ুনিবার্সিটির ভাইসচেন্সেলার হিসাবে বহুবিধ শিক্ষা সংস্কারও তিনি অনেক দিন ধরে করেছেন তাও আমরা জানি। তিনি গণিতের চর্চ্চা করলে ভাল করতেন কি আইনের চর্চ্চা করে ভাল করেছেন সেটা এখন আমাদের বিচার্য্য বিষয় নয়—তবে এটা ঠিক যে তিনি ন্যায়ের চর্চ্চার আড়ালে—শেষ পর্য্যন্ত সাহিত্য চর্চ্চাই করে গেছেন, তাতে আর কোনও ভুল নেই।

যেমন সংস্কৃতের জ্ঞানের জন্যে পণ্ডিতেরা তাঁকে 'সরস্বতী' বলতো পালির জ্ঞানের জন্যে 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী' বলতো, তেমনি আইনের জ্ঞানের জন্যে লোকে তাঁকে 'জজ' বলতো — সেটাও তো. সাহিত্য শাস্ত্রের বা শক্তির আর একটা বিকাশ বই আর কিছুই নয়।

তাঁর মতন অত বড় সাহিত্যসেবীর মধ্যে কোথাও কি এতটুকু রাজনীতির গন্ধ ছিল? রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে তিনি তো কিছুই করেননি। তাঁর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী বলার যোগ্য হ'ত যদি এ ছাড়াও তিনি এক জন কৌতুহলী বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী হতেন।

প্রমাণসাপেক্ষ প্রসিদ্ধ নিধিরাম গুপ্তের বিষয়ই দেখা যাক। আমরা সাধারণতঃ এঁকে নিধুবাবু বলেই জানি — আর চিনি একজন বড় টপ্পা ও খেয়াল গাইয়ে বলে।

কিন্তু খেয়াল ও টপ্পা যে সঙ্গীত শাস্ত্রেরই দু'টো শাখা—দু'টোই যে সেই আসল বিষয়বস্তু গানটারই বিনির্গত ভাব তাতে তো ভুল নেই—আর একই প্রতিভাশক্তি যে কোন লোককেই এর একটা বা দু'টো দিকেই উন্নীত করতে পারে সে বিষয়েও আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। নইলে সুবিখ্যাত গায়ক রসুল বক্স কখনই বলতেন না—"বাংলা দেশে নিধুর 'টপ্পার' তুলনা দেখতে পাই না। যেখানে সুরের যে পরিমাণ লয় থাকা উচিত তা এর গান ছাড়া অন্য বাঙ্‌লা গানে কোথায়? নিধুর গান শুনলে 'সরির' খেয়াল শুনছি কি 'বাঙ্গলা' টপ্পা শুনছি তাই আমি ঠিক করতে পারি না"। রসুল বক্সের এই কথায় প্রমাণ হয় না কি যে 'সরির' খেয়াল বা 'নিধুর' টপ্পা পরস্পর ভিন্ন হলেও গানেরই অন্তর্গত জিনিস?

ঋষি বেদব্যাস সম্বন্ধে শোনা যায় যে তিনি কি যুদ্ধবিদ্যা, কি দর্শন শাস্ত্র, কি নীতি শাস্ত্র, কি জ্যোতিষ শাস্ত্র সকল বিষয়েই সুপণ্ডিত ছিলেন এমন কি পুরাণ, উপপুরাণ, মানুষের মনোবিজ্ঞান কোনটাই তাঁর অজানা ছিল না। পদার্থবিজ্ঞান বা জড় বিজ্ঞানের প্রসার নিশ্চয়ই তখনকার দিনে ততটা ছিল না নৈলে অতবড় মনীষার কাছে সেটা ক'দিনের কাজ? কিন্তু তবুও এই কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে আমরা জানি কেবল মহাভারতের প্রণেতা বলে আর এই জন্যে চিনি যে এঁরই উপদেশে যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধরূপ পাপ-ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ছিলেন।

কি করা যাবে

তথাপি আমরা স্বীকার করছি যে এ রকম অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন লোক বিরল হলেও আছে। যেমন বাঙ্গালী বোপদেব এক দিন পণ্ডিতমণ্ডলীর ভেতর ভূনগেন্দ্র ও ভূবৃহস্পতি বলে খ্যাতি পেয়েছেন—রঘুনন্দন নব্য স্মৃতির আলোয সর্ব্বত্র আলোকিত করেছেন—তেমনি বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমও শুধু নবদ্বীপের কেন সমস্ত ভারতেরই ন্যায়ের সার্ব্বভৌম সম্রাট হয়েছেন। কবি কালিদাসও তাঁর অমর কাব্যপ্রতিভার তুলি দিয়ে তখনকার সামাজিক ও রাজনীতিক ছবি এমনই চমৎকার করে এঁকে রেখেছেন যে আজও পড়তে পড়তে মনে হয় যেন আমরা সত্যি সত্যিই স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে মহাকবির সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি

কিন্তু এ গুলো অনন্যসাধারণ, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার কখনই হতে পারে না। আমাদের মধ্যে ক'জনের এমন স্পর্দ্ধা আছে যে আমরা জোর করে বলতে পারি আমরা ওদের মত মা সরস্বতীর বরপুত্র হবই হব? আমাদের অবস্থা তো ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। ষোল আনা ইচ্ছা স্বর্গে যাবার কিন্তু ঠেলায় পড়ে মাঝ পথে থাকতে বাধ্য হই। যেমন গুপ্তিপাড়ার কালিদাস চাটুজ্যের অবস্থা। গান শেখার উদ্দেশ্যে উনি কাশী দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, করে গানে অনেকটা ওস্তাদ হয়ে ছিলেন বটে কিন্তু পশ্চিমা গানের সঙ্গে সঙ্গে বেশভূষাটা এমনই হিন্দুস্থানী মার্কা করে ফেলে ছিলেন যে শেষে যখন ঘরে ফিরে এলেন তখন চাটুজ্যেমশাইকে কেউ আর চিনতেই পারে না—সবাই বলে কালো মির্জ্জা এলেন গো।

কি করা যাবে

আমাদের বিখ্যাত ভোজবিদ্যা বিশারদ আত্মারাম সরকারের অবস্থাও তদ্রূপ। তিনি ছিলেন হুগলীর কমলাপুরে—গেলেন কামরূপ কামাখ্যায় যাদুবিদ্যা শিখতে। ভাল কথা—বাজীকরের কৌশল শিখেছেন কিছু অন্যায় করেননি। কিন্তু ঐ যে মাঝে মাঝে তিনি ভূত প্রেতকে দিয়ে পালকি বহাতে আরম্ভ করলেন ওটাই তাঁর কাল হ'ল। শোনা যায় ভূতেরাই নাকি এক দিন সুবিধা বুঝে তাঁর ঘাড় মটকায়। আত্মারাম যদি শুধু চালুনি ও ধুচুনিতে জল স্থির রেখেই তৃপ্ত হতেন তা হলে হয়তো যাদুবিদ্যা শেখা সার্থক হত এমন ভাবে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হ'ত না।

এই সব দেখে শুনে ভূদেব মুখুজ্জে তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যে নবজাতকদের লক্ষ্য করে যে সব কঠোর মন্তব্য করেছেন তা সত্যিই অমূল্য। তাই নেপালের তৎকালীন শিক্ষা ও শাসনসচিব সর্দার কেদারনাথ চাটুজ্জে ভূদেব মশায়ের কটাক্ষকে সমর্থন করে বলতেন যে তখনকার শিক্ষা প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল যেন কোন কিছু অজানা না থাকে। বর্তমানে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের অভিমতও তাঁদের মতেরই পোষকতা করছে কেননা তিনিও বলছেন যে ছেলেদের পড়ার বই দেখলে মনে হয়, 'কর্তাদের বিবেচনায়, যত বই পড়বে তত বিদ্যা হবে'।

আমাদের কিন্তু মন্তব্য এই যে সব কিছু অজ্ঞাত থাকার চেয়ে বরং অনেক কিছু অজানা থাকে থাকুক, তাতে ক্ষতি নেই। চৌত্রিশ বছর বেঁচে চৌত্রিশ রকম ভাষা শিখে লাভ কি?

কি করা যাবে

যে কোন একটাই ভাল করে শিখি না কেন ? আমরা বাঙ্গালী —বাংলাটাই ভাল করে শিখি—বড় জোর না হয় সংস্কৃতটাও শিখতে পারি — কেননা বাংলা ভাষার উৎপত্তি তাই থেকে। আরবী, পারসী, গ্রীক, লাটিনে আমাদের কি প্রয়োজন ? আমরা তো বাঙ্গালীর ছেলেকে বলতে চাই—না, তোমরা পাঁচ রকম শিখোনা—তোমরা শপথ কর যে তোমরা আর পাঁচমিশালী হ'বে না।

আমরা দর্শন শাস্ত্র শিখবো বলে যে আমাদের চার্ব্বাক দর্শনই শিখতে হবে এমন কোনও কথা আছে কি ? যদি দর্শন শাস্ত্রই শিখতে হয় তবে প্রথমেই ষড়্‌দর্শন শিখতে হবে—তার পর না বাকীগুলোয় মন দোব। আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে যে চটকিতে আমরা ভুলব না। স্বামী বিবেকানন্দের মত আমাদেরও বজ্র নির্ঘোষে জানাতে হবে—ওগো, বাংলার ভাইবোন! শুনছ কি ? শোনও! আজ যতই বোঝবার চেষ্টা করছি—ততই যেন বুঝতে পারছি—মানুষের সঙ্গে মানুষের তফাত কিসে। কেন তারা বড়—আমরা ছোট; কেন তারা সবল—আমরা দুর্ব্বল। শুধু শক্তি—শুধু দৃঢ় সঙ্কল্পের অভাবে। কোথায় আমাদের সে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—সে সাধনা—সে মৃত্যুপণ ? মানুষ চেষ্টা করলে পারেনা এ দুনিয়ায় এমন কি আছে ? এই একটা জিনিস না থাকলে—কোনও প্রতিভা, কোনও অবস্থা, কোনও সুযোগ সুবিধাই আমাদের মত দু'পেয়ে জানোয়ারকে মানুষ করতে পারে না—পারবে না!

তাই আমাদের প্রথমেই সঙ্কল্পে স্থির হয়ে একাগ্রতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে বিশৃঙ্খলা মহাপাপ—এর পাল্লায় পড়লে কোন কিছুই সুষ্ঠুভাবে হবার উপায় নেই। এই পাপে আজ আমাদের ছেলেদের লেখা পড়া পর্য্যন্ত সৌষ্ঠব হারিয়ে ফেলেছে। এখানে নেই কি? মাত্র পাতা উল্টে যেটা গোটা জীবনে চোখ বুলিয়ে শেষ করা যায় না—সেটাই হ'ল আমাদের পাঠ্য! ছেলেরা যে হতভম্বের মত বই গুলোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পারসী আবার আরবী, সংস্কৃত আবার উর্দ্দু, বাংলা আবার ইংরাজী, তার ওপর আবার 'হিন্দী রাষ্ট্রভাষা,' দু'রকম ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, শরীর বিদ্যা ইত্যাদি আরও কত কি! এতটুকু তো ছোট্ট মাথা! বেচারা এত বড় বোঝা বইবে কি করে? সুতরাং অবাক হবার কিছুই থাকবে না যখন আমরা শুনবো—আমাদের মধ্যে তারাই পণ্ডিত—যারাই এ সব ভাষা এবং বিজ্ঞানকে একটু চাখ্‌তে পেয়েছে। স্বাদ নেওয়া ভিন্ন তো আর গতি নেই! অত রকম সামগ্রী খেয়ে হজম করার মতন সময় কোথায়? চূড়ান্ত অনুশীলন অসম্ভব। আজ তাই শিক্ষার্থীর বংশ নির্বংশ হতে চলেছে। আজ আর পড়ুয়ার মধ্যে নিঃশেষে পান করবার সে আগ্রহ নেই—আছে শুধু ওপর ওপর চুমুক দেবার চেষ্টা।

কি করা যাবে

যদি খুব চটপট এর একটা প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয় তাহলে পাণ্ডিত্য কথাটার ইতিহাসের পাতায় স্থান হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকবে না। আমাদের সত্যিকারের শিক্ষার জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে—দৃঢ়ভাবে এই অতিবিস্তৃতি দোষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আজ আমাদের সব চেয়ে বড় অভাব লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্রতার। পূর্ব্বে একবার বলেছি—বড় দুঃখেই সে কথার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হচ্ছি।

ব্যবসায়ী কৃষ্ণপান্তী মাত্র লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্রতার গুণে রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ ধনী ও জমিদার হয়ে ছিলেন। তিনি ছেলে বেলায় কিছুমাত্র লেখাপড়া শিখতে পারেননি, কিন্তু সকাল হতে না হতেই পানের বোঝা মাথায় নিয়ে গাংনাপুরের হাটে যেতেন আর সেখানে সেই মোটটি সম্পূর্ণ বেচে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতেন। এর ব্যতিক্রম হত না। এই অসমসাহসিকতার ফলেই ক্রমে ক্রমে চোলার আর নুনের ব্যবসা করে তিনি প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করেন। এত টাকা যে কৃষ্ণনগরের রাজারাও তাঁর কাছে সময়ে অসময়ে টাকা ধার নিতেন।

চিত্রকর রবিবর্ম্মার চিত্রানুশীলনে একাগ্রতা পুরোমাত্রায় আমাদেরই মতের পোষকতা করে। পুরুষানুক্রমে এই পরিবার ত্রিবাঙ্কুরের রাজার দেওয়া জায়গীর ভোগ করতেন। ছেলেবেলা থেকেই রবিবর্ম্মার ছবি আঁকার ঝোঁক।

কি করা যাবে

তের বছর বয়সে তিনি ত্রিবাঙ্কুরে আসেন এবং তখনকার মহারাজাকে তাঁর নিজের হাতে আঁকা এক খানি ছবি উপহার দেন। এই ছবি খানি মহারাজাকে এমনই খুসী করে ছিল, যার ফলে আঠার বছর বয়সে মহারাজার এক বোনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তখন রাজ দরবারের চিত্রকর একজন ইংরেজ। রবিবর্ম্মা এত দিন রঙে জল মিশিয়ে ছবি আঁকতেন—এবারে এঁর কাছ থেকে তৈলচিত্র আঁকতে শিখলেন। তিনি ছবির পর ছবি এঁকে চলেছেন কিন্তু তখনও ত্রিবাঙ্কুরের বাইরে কেউ তাঁকে চেনে না।

এই ভাবে পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পর মাদ্রাজে একটা ললিত-কলা প্রদর্শনী হয়। সেখানে তাঁর আঁকা দু'খানি ছবি তিনি পাঠিয়ে দেন এবং তারই পুরস্কার স্বরূপ বড়লাটের কাছ থেকে একটা সোনার মেডেল পান। ছবি দু'খানি বড়লাট যুবরাজকে উপহার দিয়াছিলেন এবং সেই ছবি দেখে যুবরাজ চিত্রকর রবিবর্ম্মার অজস্র প্রশংসা করেন। তাঁর সেই চিত্রকলায় একাগ্রতার দরুন তিনি পর বৎসর মাদ্রাজ প্রদর্শনীতে যে ছবি পাঠিয়ে ছিলেন—সেই ছবিই প্রথম পুরস্কার পায়। তাঁর আঁকা ছবি 'সীতার পরীক্ষা' আর 'একটি নেয়ার মেয়ে বেহালায় সুর বাঁধছে'—এক অদ্ভুত জিনিস—বড় চমৎকার অভিব্যক্তি! এমনই প্রাণঢালা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছবি তিনি আঁকতেন যে মহীশূরের রাজা একবার চিত্রকরের মর্য্যাদা হিসাবে দু'টো সুন্দর হাতী তাঁকে উপহার পাঠিয়ে ছিলেন।

কি করা যাবে

আজীবন চিত্রানুরাগী রবিবর্ম্মা তাঁর নিজের প্রতিভায় এদেশের চিত্রবিদ্যাকে এমন এক নতুন রূপ দিয়ে গেছেন, যার জন্যে তিনি আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর। ভারতবর্ষে অনেক মহাকবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, সঙ্গীত বিশারদ জন্মেছেন, কিন্তু এঁর মতন চিত্রকর প্রাচীন ভারতে জন্মে থাকলেও আমরা তাঁর নাম শুনিনি। এঁর পরে যাঁকে আমরা চিত্রকর বলে চিনি তিনি হলেন বাঙ্গালীর সেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনিও বাল্যকাল থেকে চিত্রবিদ্যায় অনুরাগী এবং এঁরও নিজের বৈশিষ্ট্য আছে।

ঠিক এই রকম জ্ঞানপিপাসাই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে বিজ্ঞানী হিসাবে জগদ্বিখ্যাত করেছে; যার ফলে আমরা পেয়েছি 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' আর একটা বিরাট ঔষধালয়। এ ছাড়া এমন কতকগুলো রাসায়নিক দ্রব্যের আবিষ্কার তিনি করেছেন যা ইওরোপের বৈজ্ঞানিকেরাও আবিষ্কার করতে পারেননি। তিনি বলতেন যে তাঁকে রসায়নী করেছে হিন্দু আয়ুর্বেদ, চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট্, শার্ঙ্গধর ও চক্রপাণি, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস আর দর্শন; এর জন্যে তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান কারুর শাস্ত্র ঘাঁটতে বাকী রাখেননি। তাঁর কথাই ছিল মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। আদর্শে যাঁরা গোঁড়া, তাদের অনেকেই ভাবপ্রবণ বলে ঠাট্টা তামাশা করে। আমরা কিন্তু আদর্শের গোঁড়ামিটাকে বিদ্রূপ না করলেও উদ্দেশ্যের গোঁড়ামিটাকে মনে প্রাণে সমর্থন করি বলেই, চাই।

কি করা যাবে

এটা নিশ্চিত যে কেউ কখনও ধনী বা যশস্বী হতে পারে না এমন কি নিজের বা আত্মীয় স্বজনের বিন্দুমাত্র উপকারেও আসতে পারে না—যদি না সে অতিতম সদিচ্ছাপ্রবণ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে মতের গোঁড়ামি না থাকলেও উদ্দেশ্যের গোঁড়ামি পুরোমাত্রায় ছিল। কে না জানে যে ত্যাগ ও সেবা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র আর ঐ জগদ্‌ব্যাপী রামকৃষ্ণ মিশন তারই সাক্ষ্য ?

বিচারক জানকীনাথের মধ্যেও এই উদ্দেশ্যের গোঁড়ামি সমৃদ্ধ হয়েছিল খুব বাল্যকাল থেকেই। যখন তিনি ডাফ্ ইস্কুলের ছাত্র তখন একদিন সামান্য একটু দুরন্তপনা করার দরুন তিনি ইতিহাসের অধ্যাপকের বিরাগভাজন হন। ফলে তাঁর দণ্ড হয় —দণ্ডায়মান থাকা! ডাফ্ স্কুলের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রের পক্ষে নতি স্বীকার করার চেয়ে তিনি এই শাস্তিকেই মেনে নেন প্রায় মাসাধিক কাল পর্যন্ত মাথা পেতে—এমনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্যের গোঁড়ামি।

শেষে বিষয়টি অধ্যক্ষ কেদার ক্রীশ্চান মশায়ের গোচরিভূত হলে তিনি অধ্যাপককে প্রশ্ন করায় যখন জানতে পারেন যে দুরন্ত জানকীনাথ আদৌ পড়াশুনা না করার দরুন এই রূপে দণ্ডিত হয়েছেন তখনই জানকীনাথ অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁকে বলে ওঠেন—"আপনি একথা বিশ্বাস করেন যে আমি পড়াশুনা করি না? আমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন তো আপনার প্রশ্নের সদুত্তর পান কি না"?

কি করা যাবে

শোনা যায় দণ্ডিত জানকীনাথ নাকি প্রশ্নের উত্তর দান-প্রসঙ্গে অবলীলাক্রমে ইতিহাসের পঞ্চাশখানি পাতা মুখস্থ পরিকীর্ত্তন করে সকলকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করেন। এমনই ছিল তাঁর দুষ্টামির মধ্যেও গোঁড়ামি! যার গোঁড়মি নেই সে তো কোনও দিনই ভক্ত বা নিষ্ঠাবান্ হতে পারে না। এই এক কথাই রামমোহন, রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর বা যে কোন বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ও ধর্ম্মসংস্কারকের বেলাতেই খাটে।

ব্যারিষ্টার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ যদিও এফ্, এ, পাস করেই ব্যারিষ্টারী পাস করেন; তবুও তাঁর প্রসার প্রতিপত্তি ও প্রতিভার অন্ত ছিল না। জেরা করতে যেমন অদ্বিতীয়—বক্তৃতা দিতেও তেমনি পটু।

এদিকে সবচেয়ে বড় সরকারী কৌঁসিলী—আবার ওদিকে জাতিয় মহাসমিতির সভাপতি। কিন্তু একাধিক বিষয়ে পারদর্শী হলে কি হবে—তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই একটানা বইতো—কিনা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হওয়া চাই।

অবশ্য এটাই যে পরম বা চরম উৎকর্ষ তা নয়—তবে এত বড় একটা উচ্চ পদ পেতে গেলে শক্তি আর প্রতিভাকে সমাহিত করা ছাড়া উপায় আছে কি? এখনকার মতন তখন তো আর মুড়ি মিছরির একদর ছিল না কাজেই সে সময়ে 'লর্ড' উপাধি নিয়ে সহকারী ভারত সচিব বা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হওয়াটায় যথেষ্টই গৌরব এবং পৌরুষ ছিল মনে করতে হবে।

কি করা যাবে

আমাদের মতে একনিষ্ঠ হওয়া একান্ত প্রয়োজন কিন্তু একদেশদর্শী হওয়া ঘোর অন্যায়। একাগ্রচিত্ত হতে হলেই যে একচোখো হতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। আমরা উদ্দিষ্ট স্থানে যাব বলে বিপথে না গিয়ে নির্দ্দিষ্ট পথে চলার দরুন যে পথিপার্শ্বস্থ কোনও কিছু দেখতে বা শুনতে পাব না এমনটা তো হতে পারে না। পথিকের পক্ষে কি আর চোখ বুজে বা কানে তুলো গুঁজে পথ চলা সম্ভব? তাতে তো বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে।

তা ছাড়া পর্যটকের কাছে পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে দু'টো ফোটা ফুলের সৌন্দর্য্য বা একটা গানের রেশ তো সত্যিই তৃপ্তিকর। বৈরাগীর পক্ষে বৈরাগ্য ভাল জিনিস বলে কি আর সংসারীর পক্ষেও ভাল? সংসারে সব কিছুতেই অনাসক্ত হওয়ার মানে তো জীবনে যা কিছু উজ্জ্বল বা মহত্ত্ববর্দ্ধক সব কিছুতেই অনাসক্ত হওয়া নয় কি? কিন্তু উদাসীনতা তো কোন দিনই উন্নতির সহায়ক নয় বরং প্রতিবন্ধক। কি করে মানুষ সেই উন্নতি যেটা যথার্থই মহৎ বা যথার্থই পবিত্র সেটাকে উপেক্ষা করতে পারে?

প্রফুল্ল চন্দ্র রসায়ন শাস্ত্রের চর্চা করতেন বলে কি আর বিজ্ঞানের অন্য সব জিনিসকে তাচ্ছিল্য করতেন? না, দেশের সেবায় তিনি ব্রতী হননি? ব্রাহ্মণ চাণক্য 'অর্থশাস্ত্র' লিখেছিলেন বলে বুঝি আর মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্ব করেননি?

কি করা যাবে

বাংলার বার্ক রামগোপাল ঘোষ বাগ্মীও ছিলেন আবার কুঠিয়ালও ছিলেন। এঁর এমন নাম ডাক ছিল যে লোকে এঁর মুখের কথায় লাখ টাকা পর্য্যন্ত ধার দিতে দ্বিধা করত না। লোকে বল্‌ত, পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠলেও রামগোপাল ঠকাবে না। এ বিশ্বাস কি ফাঁকা কথায় হয়? শুধু যদি বক্তৃতাই সম্বল হত তাহলে অন্য সব গুণগুলো চাপা পড়ে যেত না কি?

আমরা যদি একটা নিয়েই পড়ে থাকি তাহলে আমাদের আর যা কিছু সবই শুকিয়ে যাবে—খর্ব্বাকায় হয়ে পড়বে—বাড়তে পারে না। প্রত্যেক জিনিসের সত্তায় তার নিজের এমন একটা বৈশিষ্ট্য নেই কি যা অন্যকে চেপে রাখে—ফুটতে দেয় না? তাঁতী কি বলতে গেলে জ্যান্ত মাকু নয়? দরজী কি জ্যান্ত ছুঁচ নয়? না, চাষীও হালের বলদ নয়? না হয় হ্যাট হ্যাটই করে আমরা যদি বলি উকিলেরাও চর্ব্বিত চর্ব্বন করেন—তা হলে কি খুব ভুল হবে? তাঁরা কি বেশীর ভাগই আইনের বাণ্ডিল বা পুরোন নজীরের তাড়া হয়ে দাঁড়ান না? পণ্ডিতেরা কি অনেক সময়েই এক একটি সরল 'বিশ্বকোষ' বা 'শব্দকল্পদ্রুম' হয়ে পড়েন না? কে প্রতিবাদ করবে—যদি বলি ডাক্তারেরাও ঔষধের জল-জ্যান্ত বিজ্ঞাপন? এমন দিন কি ক্রমশই ঘনিয়ে আসছে না যখন যথার্থই একটা খাঁটি মানুষকে পেতে হলে আমাদের কারুর বা মনটা—কারুর বা প্রাণটা—কারুর বা বুদ্ধিটা—কারুর বা ধড়টা সবগুলো একত্র এনে জড় করতে হবেই হবে?

কি করা যাবে

তাই যদি হয়, তবে আর আমাদের মতের গোঁড়ামি নিয়ে পড়ে থাকার সার্থকতা কোথায় ? পণ্ডিত তারা নাথ তর্কবাচস্পতি বার বছর পরিশ্রম করে তাঁর 'বাচস্পত্য বৃহৎ অভিধান' লেখেন—কেননা এটাই তাঁর ঈপ্সিত উদ্দেশ্য ছিল—কিন্তু সে জন্য তিনি তাঁর ব্যবসায়ে একটুও অবহেলা করেছেন এমন কথা তো কোন দিন শোনা যায়নি। গোবিন্দ কর্ম্মকার তো চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসী হবার এক বছর আগে থেকে তাঁর তিরোভাব পর্য্যন্ত বরাবরই তাঁর চাকর হয়ে সেবা করেছেন কিন্তু কৈ সে জন্যে তো তার 'করচা' লেখা বন্ধ ছিল না। সত্যি বলতে কি মনটা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গেলে ক্ষতি তো হয়ই না বরং একটু আধটু আনন্দই পাওয়া যায় যার ফলে আমাদের সিদ্ধির পথে সহায়তাই হয়। আমাদের এইটুকু সতর্ক হলেই চলবে যেন আমরা আসল কাজটায় অন্যমনস্ক হয়ে অন্যের দিকে এগিয়ে না যাই।

অর্জ্জুনের মত আমাদের মনে রাখতে হবে যে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় গেলে প্রতিশ্রুত লক্ষ ভেদ ছাড়া দ্রৌপদীকে পাওয়া যাবে না বা আনা সম্ভবপর হবে না। লক্ষ্মণের গণ্ডির বাহিরে যাওয়ায় যখন স্বয়ং সীতাদেবীকেই অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে তখন আমরা সীমা ছাড়ালে বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে কি আর দাঁড়াতে পারব ? ঈশ্বরকে লোকে যেমন মানে, আমাদেরও তেমনি আরাধ্য জিনিসটাকে দেবতার মতই মানতে হবে

কি করা যাবে

কোন এক পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মশাইকে তিনি কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মানেন কিনা এ কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি যেমন হাসতে হাসতে তাঁর বাপ মাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে ছিলেন —ঐ তো আমার বিশ্বেশ্বর আর অন্নপূর্ণা—জিজ্ঞেস করুন আমি মানি কি না! তেমনি আমরাও যাতে ঈশ্বর জ্ঞানে অভিষ্ট বিষয়ে নিবিষ্ট থাকতে পারি এই যেন আমাদের আকিঞ্চন হয়! অর্দ্ধেন্দু মুস্তোফীর মত বিদ্যাসাগরের চটি বুকে করে আমরাও যেন বলতে পারি আজ আমাদের ঘা দেওয়া সার্থক হয়েছে।

বর্দ্ধমান জেলার গুস্করা থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে কোন এক পল্লীগ্রামে লোচন দাসের বাড়ী। ছেলে বেলায় তাঁর লেখা পড়া না হলেও তিনি সতের বছর বয়সেই 'চৈতন্য মঙ্গল' বলে বই লেখেন। শোনা যায় অতি অল্প বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়ে ছিল কিন্তু তিনি শ্বশুর বাড়ী যেতেন না। একবার তাঁর গুরু নরহরি ঠাকুরের হুকুমে তিনি শ্বশুর বাড়ী যেতে বাধ্য হন। পথ ধরে যেতে যেতে তিনি যখন তাঁর যে গ্রামে শ্বশুর বাড়ী সেখানে উপস্থিত হলেন, তখন পথের ধারে একজন যুবতীকে দেখে জিজ্ঞেস করেন—"মা, অমুকের বাড়ী কোথায়?" যুবতীর বলে দেওয়া রাস্তা ধরে শ্বশুরবাড়ীতে উঠে তিনি শেষে জানতে পারেন যে সেই যুবতী তাঁরই স্ত্রী। শুধু মা বলে ডাকার দরুন তিনি আর স্ত্রীকে স্ত্রীভাবে না নিয়ে সাধন সঙ্গিনী করে নেন—এমনই তার অভিপ্রায়ের বিশিষ্টতা।

কি করা যাবে

হরিনাথ দে খুব অল্পই জন্মায় এবং আমাদের মনে হয় না যে এঁদের মৃত্যুর পর এঁদের কাজগুলো আর বেঁচে থাকে। এঁদের অদ্ভুত ক্ষমতা সত্যিই আমাদের অবাক করে দেয়—এবং এঁদের মতন ভাষাবিদের মৃত্যুর পর যে এঁদের শক্তির সাক্ষ্য দিতে আর কিছুই পড়ে থাকে না—সেইটে দেখে আমরা আরও অবাক হয়ে পড়ি। হরিনাথ জীবনে যত জলপানি পেয়েছেন অত বোধ হয় আর কেউ পেয়েছে কিনা সন্দেহ কিন্তু অত কিছু পেয়েও তিনি কি রেখে গেছেন এটা ভাবলে হতশ্রদ্ধ হতে হয় না কি?

আমরা দুঃখ করি আমাদের পদে পদে বাধা—পদে পদে অসুবিধা—যার জন্যে আমরা এক পাও এগোতে পারি না! কিন্তু ভাবি না যে আমাদের পঁচিশ রকম চেষ্টা আর দাবি-দাওয়াই আসলে আমাদের পথ রোধ করে। সত্যিকারের অভাব কতটুকু? হাতোম পঁ্যাচার নক্সায় আমরা দেখতে পাই না কি যে আমাদের গৌরব লাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয়কেও ছাপিয়ে ওঠে—কখনও বা মনে হয় আমরা কালিদাস হব—আবার কখনও বা মনে হয় রামমোহন রায় হব। কিন্তু যে হেতু কালিদাস বড়ই লম্পট—সে হেতু হওয়া যায় না! আবার রামমোহন রায় হওয়াও মুস্কিল—বিলেতে মরতে হবে! সুতরাং কেউ বিষ্ণুর মধ্যে যখন একটাও কিছু হওয়া যাবে না তখন আর চেষ্টা করে লাভ কি? এই না আমাদের মত?

কি করা যাবে

কিন্তু এইটেই আমাদের কাল! আমাদের ভুললে চলবে না যে উন্নতির মূলে হচ্ছে একাগ্রতা—আর অবনতির মূলে হচ্ছে চঞ্চলতা। আমাদের একটা ছেড়ে আর একটায় আদৌ যাওয়া চলবে না। আমাদের ধ্যান জ্ঞান হবে টিকে থাকা। একটা কিছু ভাল করে করতে গেলে যে শক্তির—যে তন্ময়তার দরকার—সেই শক্তি সেই তন্ময়তা পাঁচটাতে দেওয়া সম্ভব কি? তাই কর্তব্যে মতি স্থির করে আমাদেরও উদ্দেশ্যের পিছু পিছু ছুটতে হবে সর্ব-শক্তি দিয়ে—যেমন ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত ছুটে ছিলেন শাঁখারিকে নিয়ে—ডাইনে বাঁয়ে কোনও দিকে ফেরা হ'বে না। ঐতো ধোপার মেয়েটা এখনও ঠিক তেমনি ভাবেই বলছে—"বাবা, বেলা যে গেল, বাস্‌নায় আগুন দাও"! কৈ আমরা বাসনায় আগুন দিতে পারলুম? কৈ আমরা বলতে পারলুম?—

"তুঝ্‌সে হাম্‌নে দিল্‌ লাগায়া
যো কুছ্‌ হ্যায় সব্‌ তুঁহি হ্যায়।
একুল তুঝ্‌কো হাম্‌নে পায়া
যো কুছ্‌ হ্যায় সব্‌ তুঁহি হ্যায়।

—ঃ ✿ ঃ—

কি করা যাবে?

উৎসাহ সম্বন্ধে

চার

—:O:—

এখন আমরা ধরে নিতে পারি যে আমরা শেষ পর্যন্ত যে কাজই করি না কেন আমাদের আসল উদ্দেশ্য হ'ল সেটাতে কৃতকার্য হওয়া। কেননা 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি' অর্থাৎ কীর্ত্তিমান যারা তারাই চিরজীবী। তা ছাড়া ভগবান যখন বুদ্ধি বলে জিনিসটা আমাদের দিয়েছেন তখন সেটাকে কাজে লাগান আমাদের একান্ত দরকার। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে; কথা এই যে, কৃতকৃত্য হ'তে হলে কতকগুলো ব্যবস্থা না মেনে উপায় নেই। কারণ সেগুলো কাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করে বলেই আমাদের বরাত সুপ্রসন্ন হয়। আমরা মনে করলেই কি গাছে উঠ্‌তে পারি? গাছে কিম্বা পাহাড়ে উঠ্‌তে কি গায়ের জোর ও মনের জোর দু'টোরই দরকার হয় না? তাই যদি হয় তা হলে, তেমন তেমন একটা পণ্ডিত, একটা ব্যবসাদার, বা একটা এঞ্জিনিয়ার কিম্বা একটা কালোয়াত হতেও তো আরও পাঁচ রকম জোর জিগীষার বিমিশ্র সমাবেশ চাই।

কি করা যাবে

আমাদের ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকে এক করে কাজে না লাগালে চলবে কি ? অথচ সেটা করতে হলে আমাদের উপযুক্ত শিক্ষারও প্রয়োজন। বুদ্ধি থাকলেই যে সব গোল মিটবে তাও তো নয়—চাই হিতাহিত বিবেচনা। চালাক, চতুর ও ফন্দিবাজ হওয়ার চেয়ে কি কর্মঠ, সহিষ্ণু ও দূরদর্শী হওয়া আরও ভাল নয় ?

আমরা যাই করি না কেন, আমাদের তিনটে জিনিস না মেনে উপায় নেই—নিষ্ঠা, মতি, আর উৎসাহ। মানুষ যদি এই তিনটিকে অবলম্বন করে না চলে তো তার ভরাডুবি কেউ রোধ করতে পারে না। আমরা যতই বুদ্ধি ধরি না কেন শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কাজের বশীভূত হয়ে পড়বেই—কাজ-কর্ম কোন কালেও বুদ্ধির বশ হবে না।

রামচন্দ্র কি বোকা ছিলেন বলে স্বর্ণমৃগের পিছু নিয়ে ছিলেন এটা মনে করতে হবে ? তাই বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্যে আমাদের নিষ্ঠাটা যেমন সময়ের দিক দিয়ে দরকার তেমনই দরকার ন্যায়ের দিক দিয়ে। মতি স্থির রেখে খুব বিবেচনা ও উৎসাহের সঙ্গে কাজে নামলে তবেই না সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে।

একথা সত্যি যে কিছু লোক হয়তো বা হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠে কিন্তু তা বলে সবাই যে হুট বলতেই বড় লোক হয়ে পড়বে সেটা কল্পনাও করা যায় না বা সম্ভবও নয়।

কি করা যাবে

যদিও আমরা জানি যে ব্রেজিলের নৌসেনা বিদ্রোহী হয়ে নাথেরয় দখল করলে আমাদেরই কর্পোরাল সুরেশ বিশ্বাস পাঁচটি মাত্র সেনার অধিনায়কত্ব করে একটি আঘাতে সেই বিদ্রোহকে চুরমার করে পদাতির প্রথম লেফ্‌টেনণ্ট হয়ে ছিলেন—তবুও বলবো তাঁর এ উন্নতির মূলে ছিল ব্রেজিলের ধর্ম্মরক্ষার চেষ্টা। ব্যবসাদারের পক্ষে হঠাৎ এতবড় উন্নতি হলে সেটার লয় প্রাপ্তিও হঠাৎ না হয়ে পারে না। তাই যারা কাজের লোক আমরা তাদের নিষ্ঠা, মতি ও উৎসাহকে মূলমন্ত্র করে এগতে বলি। সময়নিষ্ঠ হয়ে মতিস্থির করে উৎসাহের সঙ্গে চল্‌তে পারলে তবেই না আমরা ব্যবসায়ী লোক বলে গণ্য হ'ব? তবেই না লোকে আমাদের চাইবে? কেবল চাট্‌নি খেয়েই যদি পেট ভরতো তাহলে ভাত ডাল কেউ খেত কি?

আমেরিকার লোকে যাঁকে বাঙ্গলার 'রথচাইল্‌ড' বলতো সেই রামদুলাল সরকার ভোরে উঠতেন এবং সেই যে বিল-সাধার কাজ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরতেন তা কোনও দিন বা বাড়ি ফিরতেন কোনও দিন বা সারা রাত গাছতলায় কেটে যেত—বাড়ী ফেরা তার অদৃষ্টে হ'ত না। এমনই কষ্টসাধ্য কাজ নিয়ে তিনি মনিব মদনমোহন দত্তর আপিসে কার্য্যশিক্ষার্থী হয়ে ঢোকেন। তাঁর মাতামহীও সেই বাড়িতেই রান্না করতেন—এই ছিল তাঁদের তখনকার অবস্থা। কিন্তু তাতে কি আসে যায়—তিনি প্রাণপণ যত্নে মনিবের কাজ করতে ছাড়তেন না।'

কি করা যাবে

শোনা যায় একদিন তিনি দমদমার এক গোরা সাহেবের কাছে বিল দেবার পর টাকা পেতে তাঁর দেরী হয়ে পড়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে—সঙ্গে একগাদা টাকা—তিনি কলকাতা চলেছেন। তখনকার কলকাতা মানে চারপাশে ডাকাতের আড্ডা। সুতরাং অত টাকা নিয়ে পথ চলাও বিপজ্জনক—তাতে আবার রাত্রিতে রামদুলাল মহামুস্কিলে পড়ে একবার মনে করলেন কোথাও আশ্রয় নেবেন—আবার ভাবলেন যে যদি আশ্রয়দাতাই তাঁকে মেরে টাকাটা কেড়ে নেয়—তখন কি হ'বে ?

পাঁচ সাত মিনিট চিন্তা করার পর তিনি মতিস্থির করে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কাপড় চোপড় ছেড়ে ফকিরের বেশ ধরে টাকার থলি মাথায় দিয়ে গাছতলায় রাত কাটিয়ে সকালে বাড়ি এসে মনিবের টাকা মনিবের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর এই কার্যদক্ষতা ও শ্রমসহিষ্ণুতা যে সত্যিই তাঁকে ভবিষ্যতে বিখ্যাত ধনী ও ব্যবসায়ী করেছিল তা আমরা তাঁর মনিব মদনমোহন দত্তের প্রত্যেকটি ব্যবহারে বুঝতে পারি।

প্রথমে তিনি মাইনে পেতেন পাঁচ টাকা, তারপর সেটা বেড়ে হয় দশ টাকা। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রভুর কাছে পাওয়া লাখ টাকা বকশিশের কৃপায় তাঁর নিজের ব্যবসাও পুরোদমে চলছে। সাধুতা ও অধ্যবসায়ের পুরস্কারে রামদুলালের চারখানা জাহাজভরা মাল আমেরিকার বাজার ছেয়ে ফেলেছে—সেখানকার সমস্ত বাণিজ্যাগারের তখন তিনিই একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি।

কি করা যাবে

ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় আবার লাভেরও অন্ত ছিলনা—এক-চেটে ব্যবসা—তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু এত উন্নতিতেও রামদুলালের অহঙ্কার বলে জিনিসটা ছিল না। তিনি নিজে হাতে যেমন সব কাজ করে নিজের কর্ম্মচারীদের উৎসাহ দিতেন তেমনি মদন দত্ত যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তাঁর চাকরীও ছাড়েননি। ততদিন তিনি সামান্য পোষাকে জুতো খুলে মনিব বাড়ি ঢুকতেন এবং মাস কাবারে সেই দশ টাকা মাইনেও ঠিক নিয়ে আসতেন।

কোটিপতি হয়েও রামদুলাল নিজের পূর্ব্বাবস্থা একটি দিনের জন্যেও ভোলেননি। তখনও যে তাঁর মধ্যে নিষ্ঠা, সততা ও উৎসাহ পুরাপুরি বজায় ছিল এটাই তার প্রমাণ।

জাতে কৈবর্ত্ত ও চাষী হরেকৃষ্ণের মেয়ে রাণী রাসমণিও দরিদ্রের ঘরে জন্মে এবং প্রতিপালিত হয়ে গরিবের দুঃখ যে কি তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন। গরিবের মেয়ে হয়েও তিনি অসাধারণ সুন্দরী বলে কলকাতার মস্তবড় ধনী সাড়েদের ঘরের বউ হন। বিয়ের চার বছর আগেই তাঁর মা মারা যান—আবার বিশ বছর যেতে না যেতেই স্বামী গত হন।

তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে কিন্তু তিনি নিজে হাতেই শ্বশুর বাড়ির বিপুল সম্পত্তির ভার নিয়ে তার যথাসাধ্য উন্নতি করে ছিলেন—একটুও নাবড়াননি। তাঁর বিষয়বুদ্ধি যেমন তেমন ছিল না। একদিকে তিনি যেমন তেজস্বিনী ছিলেন অন্যদিকে তেমনি তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও সাহস ছিল।

কি করা যাবে

সিপাই বিদ্রোহের সময় যখন ইংরাজ রাজত্বের যায় যায় অবস্থা—কোম্পানির কাগজের দর হুড় হুড় শব্দে নেমে যাচ্ছে—বুদ্ধিমতী রাসমণি তখন কম দামে বিস্তর কাগজ কিনে ফেলেন। এতে তাঁর বহু টাকা লাভ হয় এবং কি করে আস্থার জোরে গরীবের মেয়েও 'রাণী' হতে পারে তা তিনি জগতের লোককে দেখিয়ে যান।

পরিস্কার দেওয়ান রামকমল সেনও এক দিন হিন্দুস্থানী ছাপাখানায় আট টাকা মাইনের সামান্য কম্পোজিটারের কাজ করতেন। অনেক ঝড় জল ও রোদ ভোগ করে তারপর এক হাসপাতালে এবং সেখান থেকে ফোর্টউইলিয়ম কলেজে তাঁর কাজ হয়। শেষে বার টাকা মাইনেতে এসিয়াটিক সোসাইটি সভার কেরাণী হন। এই সামান্য কেরাণীগিরি থেকে ক্রমে ঐ সভার সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদকের কাজ পান।

সমস্ত চব্বিশ পরগণায় খুব কম লোকই বোধ হয় অমন আন্তরিক চেষ্টায় আট টাকা মাইনের কেরাণী থেকে টেঁকশালের এবং পরে ইমপিরিয়ল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হয়ে দু'হাজার টাকা আয়ের অধিকারী হ'তে পেরেছেন।

বোম্বাইয়ে অতি দীন দরিদ্রের ঘরে জন্মে কি করে জে, এফ, মাডান' ক্রমশঃ উন্নতি করে ছিলেন সেটা সত্যিই একটা শেখবার জিনিস।

কি করা যাবে

তিনি গল্প করতেন—তাঁর বয়স তখন ন'দশ বছর হবে অত্যন্ত কষ্টে পড়ে সেই অল্প বয়সেই তিনি এক দিন নোংরা জামা জোড়া পরে এক থিয়েটারের আপিস ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাদের কোনও অভিনেতার প্রয়োজন আছে কি না। একজন তাঁর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে রুক্ষস্বরে উত্তর দেয়—'না! না!'

উত্তরটা রূঢ় হলেও তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি যেহেতু তিনি তৎক্ষণাৎ ভেবে দেখেন যে তাঁর পোষাকটা তো ঠিক অভিনেতার মত হয়নি—হয়েছে চাকরের মতন। তিনি বাড়ী ফিরে আসেন এবং পরদিন একটু পরিপাটি হয়ে ফের সেখানে যান ও এবার জিজ্ঞাস করেন—তাঁদের কোনরূপ কর্ম্মচারীর দরকার আছে কি না।

এবারে উত্তরটা কিন্তু মোলায়েম ভাবে আসে—'না তো! না!' মাডান তখন নিতান্ত হতাশ হয়েই পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—'একজন অভিনেতারও কি দরকার হবে না? যে কোনও মাইনেয়? মাইনেটাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—আমার উদ্দেশ্য কাজ শেখার এবং কাজের লোক হবার'। তাঁর এই কথা ক'টিই তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে এবং অতি অল্প মাইনের—এমন কি খাওয়া পরাও চলে না—মাত্র চার টাকায় ওই থিয়েটারেই তাঁর একটা অভিনেতার চাকরি হয়।

কি করা যাবে

অত বড় বিখ্যাত ব্যবসায়ী হয়েও ম্যাডান ভোলেননি যে তাঁর ছোট সামান্য চাকরি এবং সামান্য উপার্জনই কালক্রমে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যায় ও ভারতজোড়া বায়স্কোপ থিয়েটারের একচেটিয়া অধিকার করে—যার ফলে তিনি বাঙ্গলা দেশের প্রধান সহরে ব্যবসায়ী বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং শেষ জীবনটা আরামে কাটিয়েও লক্ষ লক্ষ টাকা দান করে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন ও পার্শী নির্বিশেষে সকলের শুভেচ্ছা সমান ভাবে কুড়িয়ে ছিলেন।

তাঁর মুখে এ কথা প্রায়ই শোনা যেত যে চার টাকা মাইনের চাকরি হলে কি হয় তিনি দরকার হ'লে আরও পাঁচ জনের কাজ যোগাড় করে দিতেন। কখনও এক ঘণ্টার জন্যেও কোনও দিন ছুটি নেননি—তা ছাড়া তাঁর যদি সন্ধ্যা ছটায় উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন হ'ত—তিনি এসে হাজির হতেন বেলা ৫টায়। বিরক্তি বলে কোনও জিনিস তিনি জানতেন না—বরঞ্চ অন্য কারুর কোন বিশেষ দরকার থাকলে—তিনি তার কাজটাও উপরপড়া হয়ে করে দিয়ে নিজেকে মনিবের কাছে প্রিয়পাত্র ও অপরিহার্য করে তুলতেন।

ধৈর্য ও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করলে ভগবান যে আমাদের সহায় হন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তার সঙ্গে আরও যে দু'টো জিনিসের দরকার—সে দু'টো হ'ল ব্যাকুলতা ও নির্ভরতা।

কি করা যাবে

আমাদের মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমরা প্রায়ই আদিষ্ট হতাম—'উঠে পড়ে লেগে যাও'—অর্থাৎ কষ্ট স্বীকার করে এক মনে কার্যসিদ্ধির জন্যে ডুবে থাক। আমরা বলি, দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করা আরও সহজসাধ্য হবে যদি আমরা তার সঙ্গে লজ্জা, ঘৃণা, এবং ভয়কে আমল না দিই!

একদিন সকালে যখন তাঁর মামা ধান্যকুড়িয়ার পাটের আড়তে পায়চারি করছেন এমন সময় শ্যামাচরণ সেখানে এসে একটা কিছু কাজের প্রার্থনা জানালেন। তাঁর বাবা ৺কালাচাঁদ বল্লভের বাড়ী বারাসতের শ্বেতপুরে এবং তাঁরা জাতিতে সদ্গোপ। বাপের মৃত্যুর পর শ্যামাচরণ মামার বাড়ীতে থেকে কিছু লেখা পড়া শিখলেও তাঁর কাজ করার ঝোঁক অন্তরে প্রবল হয়ে উঠে। তাই মামার কাছে আব্দার ধরেন—'মামা, একটা কাজ দাও'!

"কাজ—কাজ—ও? তুই কাজ করবি?"

"হাঁ, মামা! বসে বসে বিরক্তি ধরে যাচ্ছে; আমি কিছু করতে চাই"।

"সে তো খুব ভাল কথা! আমি তোকে কাজ দিচ্ছি। ঐ যে পাটের গাদাটা দেখছিস্..."

"হাঁ"!

"আচ্ছা! ঐ গাদাটাকে ওখান থেকে নিয়ে এসে এখানে জড় করে রাখ, কেমন?"

"বেশ"।

"তোর হয়ে গেলে বাড়ীতে গিয়ে আমায় বলবি"।

উৎসাহের সঙ্গে শ্যামাচরণ সেই যে কাজে লেগে গেলেন—কাজ যখন শেষ হ'ল তখন বেলা দুটো। তিনি বাড়ী গিয়ে মামাকে জানিয়ে স্নানাহার সেরে আবার মামার কাছে আর একটা কাজ চাইতেই তিনি বললেন—

"আরও কাজ? আচ্ছা! এবার ঐ খালি জায়গাটা বেশ করে ঝাটপাট দিয়ে ফের ঐ পাটগুলোকে এনে ওখানেই থাক্ দে। বুঝলি?"

"আচ্ছা"।

কোন রকম বিরক্তি না দেখিয়ে শ্যামাচরণ আবার কাজ আরম্ভ করলেন—যদিও কাজটা একঘেয়ে—তবুও সন্ধ্যা হব হব সময়ে কাজটা শেষ করে তিনি মামার আসার অপেক্ষায় যখন একদৃষ্টে পথের দিকে চেয়ে আছেন—এমন সময়ে মামা এসে বললেন—

"বা! বেশ হয়েছে। কাজ শেষ হয়ে গেছে?"

"হাঁ"।

"বেশ! বেশ! তারপর; কি করবি বল"?

"আরও কাজ করবো! দাও!"

"তা বেশ; তা বেশ! এখন এই সিকিটা নিয়ে জল খেয়ে আয়—যা!"

কি করা যাবে

"জল তো খাব! আর কিছু কাজ দেবে না?"

"দোব! দোব! কাজের আবার ভাবনা কি? কাল সকালেই দোব।"

পরদিন সকালে শ্যামাচরণ তাঁর মামা এসে পৌঁছনোর আগেই আড়তে গিয়ে হাজির হলেন কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হলেন যখন শুনলেন যে মামার হুকুম হয়েছে ঐ পাটগুলোই ফের সরাবার। পরে তিনি আরও হতভম্ব হয়ে ছিলেন যখন বার বার চারবার তাঁকে ঐ এক কাজই করতে হয়। তিনি দ্বিরুক্তি না করে বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে কাজটিকে তুলে যখন ফের মামার সঙ্গে দেখা করতে যান তখনই তাঁর ওপর আদেশ হয় পাতিপুকুরে পাটের আড়ত খোলবার এবং সেটার দেখাশুনো করবার।

মামার কাছ থেকে এই কাজের ভার পেয়ে শ্যামাচরণের অন্তঃকরণ এমনই কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিল যে মুখে তাঁর আর একটিও কথা সরেনি। তবে এই দায়িত্ব নিয়ে তিনি এমনই যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন যার ফলে পাতিপুকুরের এই আড়ত দেখতে দেখতে এই অঞ্চলের সব চেয়ে বড় আড়ত হয়ে দাঁড়ায়।

এই সময়ে শ্যামাচরণের বিয়ে হয় এই খান্যকুড়েরই পতিতচন্দ্র সাউএর একমাত্র কন্যার সঙ্গে এবং শ্বশুর ও মামা দুজনের সঙ্গে মিলে ইনি পাতিপুকুরেই পাটের গাঁটের কল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেন।

কি করা যাবে

এই কলের টাকায় একদিকে তিনি ব্যবসা বাড়াতে আরম্ভ করেন আর একদিকে জমিদারি কিনতে থাকেন। পাটের ব্যবসায় ইনি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে লোকে এক সময়ে এঁকে 'জুট লর্ড' বলে জানতো।

আর একজন যাঁকে আমরা পাকা উকিল বলে শুনেছি তিনি হলেন রামলোচন দত্তের ছেলে কালীকুমার। মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মানর দরুন তাঁকে দুঃখ-দারিদ্রের সঙ্গে বেশ কিছুটা লড়াই করে তবে উঠতে হয়। কিন্তু সে যাহোক ওঠা নয়—ব্যবসায় এমনই উন্নতি হয়েছিল—এসার প্রতিপত্তি এতদূর বেড়ে উঠেছিল —যে শেষ পর্যান্ত মাসে হাজার টাকারও বেশী দান করায়—উকিল কালীকুমারকে লোকে 'দাতা কালীকুমার' বলেই চিনতো। তখনকার এক হাজার টাকা মানে এখনকার বিশ হাজার টাকা। সুতরাং এ থেকেই তাঁর আয়ের পরিমানটা বুঝতে বাকী থাকে না।

যখন তিনি প্রথমে দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করতে আরম্ভ করেন তখন কোন কোন দিন তাঁর বাড়ীতে তিন চারশো খানা পাতা পড়তো। তারপর যখন তিনি জরিপ আদালতের উকিল তখন কোন কোন দিন তাঁর বাড়ীতে অন্ততঃ তিন চারশো লোক খেতে পেত। এমনও শোনা গেছে যে সেই সব অতিথি অভ্যাগত ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বসে তিনিও খেতেন—তাঁর জন্যে কোনও রকম আলাদা ব্যবস্থা তিনি পছন্দই করতেন না।

কি করা যাবে

কালীকুমারের কাছে এত লোক সাহায্য পেয়েছে যে তার আর ইয়ত্তা নেই। একবার এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়ী এসে ওঠেন। দু'চার দিন সেখানে থাকার পর এক দিন কালীকুমার যেমন কাছারী যাবার জন্যে উদ্যত হয়েছেন, অমনই ব্রাহ্মণ এসে বললেন,—"বাবু, আমি যে ক'দিন হল বসে আছি; আমার কি কিছু ব্যবস্থা হবে না"? কালীকুমার যুগপৎ উত্তর দিলেন,—"তাই তো! আচ্ছা, আজ কাছারীতে যা পাব, সব আপনাকে দোব"। তাই হ'ল।

সে দিন তিনি পাঁচশো টাকা পেয়ে সমস্ত টাকাটা বাড়ি এসে ব্রাহ্মণকে দান করলেন। এতে তাঁর কোন কোন আত্মীয়স্বজন আপত্তি করলে তিনি তাদের বিরক্তিকর হলেও বলে ছিলেন,—"এ তোমরা অন্যায় করছ! আমি কি রোজ এত টাকা পাই? আজ ব্রাহ্মণকে দোব বলে ছিলাম বলেই না ভগবান আমাকে অত টাকা দিয়েছেন— ওটা ওঁরই প্রাপ্য"।

আমাদের হুগলী বালির বিখ্যাত ব্যবসায়ী গোরী সেনের অবস্থাটা অনেকটা এই রকম হলেও তফাত এই যে এঁকে জোচ্চোরেরা পর্যন্ত মিথ্যা দাবী জানিয়ে অনেকে অনেক টাকা ঠকিয়েছে। এঁর বাপ হরেকৃষ্ণ মুরলীধর সেনের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না বলে গোরী সেন খুব সামান্য টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করতে বাধ্য হন। আসল মূলধন বলতে এঁর ছিল—ব্যবসায়-বুদ্ধি আর সাধুতা।

কি করা যাবে

তার ওপর আরও দু'টো জিনিস ছিল, ন্যায়নিষ্ঠা এবং উৎসাহ যার জন্যে কালে ইনি এমনই সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যবসায়ী হয়ে ছিলেন যে কী ব্যবসায় জগতে কী ব্যয়-সাপেক্ষ কাজে সারা দেশময় প্রবাদ গড়ে উঠেছে—'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'।

ভবিষ্যতে অত বড় ধনী কিন্তু প্রথমটা ব্যবসায়ে নেমে দুবেলা দুটি ভাতের বেশী তিনি আর কিছু আকাঙ্খা করতে পারেননি। তাঁর কারবারী তীব্র আকাঙ্ক্ষাই কিছু দিন বাদে তাঁকে কলকাতার বড়বাজারে নিয়ে গিয়ে তখনকার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বৈষ্ণব চরণ শেঠের কারবারে অংশীদার করে।

গৌরী সেনের কারবার গড়ে উঠে ছিল মালের চালানি কারবারে। হুগলী এবং কলকাতা থেকে মাল সংগ্রহ করে তিনি সেগুলো মেদনীপুরে রপ্তানি করতেন। আবার মেদনীপুর থেকে বিনিময়ে মাল আমদানী করে সেটা কলকাতার বাজারে চালু করতেন।

নানান রকম মালের চালান থাকলেও তিনি সাধারণতঃ ধান, চাল, কলাই এবং খনিজ দ্রব্য নিয়েই ব্যবসা করতেন। ভৈরব চন্দ্র দত্ত নামে এক কায়স্থ ভদ্রলোক মেদনীপুরে তাঁর এজেণ্ট ছিলেন। ব্যবসায়ে যখন তাঁর খুব বোলবোলাও—নিজের মনের তেজে একাই একশো—যে নৌকা বোঝাই করে রাং পাঠাচ্ছেন—এই সীসে পাঠাচ্ছেন ঠিক এমনি সময়ে তার ভাগ্যের পারাটা বদলে যায় হঠাৎ একটি ঘটনায়।

কি করা যাবে

সে'বার সাতখানি নৌকা বোঝাই করে তিনি মেদনীপুরে রাং পাঠিয়েছেন—ভৈরবচন্দ্র মাল খালাস করতে গিয়ে দেখেন সে গুলো রাং নয় রূপো—তাই তিনি সব ক'খানি নৌকাই ফেরত দেন। এখনকার লোক হলে হয়তো মেরে দিতেন—হাজার হলেও তখনকার লোক—তিনি ওটুকু আর পারেননি। এদিকে নৌকা ফিরে আসার আগেই গৌরী সেন স্বপ্ন দেখেন যে নারায়ণের কৃপায় রাং রূপো হয়ে তাঁর কাছে ফেরত আসছে। ওই রূপো বিক্রি করে তিনি প্রচুর টাকা পেয়ে ছিলেন বটে কিন্তু এটাও বুঝেছিলেন যে টাকাটাকে সরাতে না পারলে টাকা দেনেওয়ালাকে তো পাওয়া যাবে না—সুতরাং ত্যাগেরই দরকার।

তাই তিনি নিজের বাড়িতে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করে যেমন একদিকে শিব পূজো আরম্ভ করেন তেমনি আর একদিকে দু'হাতে বিচার বিবেচনা না করে লোককে টাকা দিতে থাকেন। আমাদের মনে হয় প্রচুর টাকা রোজগার করেও যে তার মনে অহঙ্কার স্থান পায়নি তার একমাত্র কারণ এই টাকার সদ্ব্যবহারে তাঁর কোন রকম খুঁত ছিল না। যেখানেই কেউ কাজ আরম্ভ করে শেষ করতে অপারক হয়েছে সেই খানেই হাত পাতলে গৌরী সেন টাকা দিয়ে তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেছেন—এ দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি।

কি করা যাবে

প্রেমের পথই পথ আর ব্যাকুলতাই তার পাথেয়। পথে বিপদ তো আছেই আর আছে বলেই তো প্রতিভাও আছে। ধাক্কা সামলাবার শক্তি ছাড়া প্রতিভা বিকাশের অবকাশ কোথায়? বিশিষ্ট আগ্রহ ছাড়া কি কীর্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব? শুধু অন্তর্দৃষ্টি বা কল্পনা শক্তি নিয়ে কেউ কি বড় হতে পারে? আমাদের তো মনে হয় না যে হঠাৎ উদ্দীপনার বশে কেউ কখনও নামজাদা গায়ক বা নর্ত্তকী হতে পেরেছে।

উচ্ছ্বাস, অদৃষ্ট, ভগবদ্‌প্রেরণা ওসব ভাবুকের কথার কথা বৈ আর কি? প্রতিভার সেই যে তপস্যা—সেই যে সাধনা—যেটা আয়াভট্টকে, লালাবাবুকে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে, বুনো রমানাথকে ও ঋষিবরকে বড় করেছিল সেটা কি নিছক ভাগ্য? না, সাধারণের কাছে যেটা তুড়ি দিয়ে হবার নয় সেটা প্রতিভাশালীর কাছে কষ্টসাধ্য হলেও সুলভ বলে আমরা ধরেনি ওটা দৈব বা স্বতঃস্ফূর্ত?

আমরা যদি ধরেনি যে প্রতিভা আর দৈবশক্তি এক জিনিস—প্রতিভায় পরিশ্রমের আদৌ প্রয়োজন নেই তাহলে আমরা মস্ত ভুল করবো। চেষ্টা ছাড়া প্রতিভা ফুটতেই পারে না। যদি পুরষাকারকে একান্ত ভাবে, শুধু দৈবশক্তি কেন, সর্ব্বশক্তি দিয়ে কেউ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তো সেটা একমাত্র প্রতিভাই পারে।

সেইজন্যে প্রতিভাশালী লোক মাত্রেই আর আর সবাই এর চেয়ে তার নিজের আদর্শ নিয়ে আপ্রাণ খাটে কেননা তার প্রতিভা খাটুনির উপযুক্ত মূল্য দিতে কোন দিনই কৃপণতা করে না বরং আরও বেশী দেয়। এটা তো জানা কথা যে কারুর কাছে কিছু চাইতে নেই। চাইলে হয় তো বা মিলতে পারে কিন্তু সেটা সামান্য। না চাইলে অর্থাৎ চেষ্টা করে যেটা পাওয়া যায় সেটা অনেক বেশী। কে না জানে—'বিনা মাঙ্গে মোতি মিলে, মাঙ্গে মিলে না ভিখ্' ?

ভিক্ষুকের পক্ষে যেটা সত্যি—গাইয়ে, বাজিয়ে, অভিনেতা বা পণ্ডিতের পক্ষেও সেটা তেমনিই সত্যি। তানসেন যতটা ধৈর্য্যশীল ও পরিশ্রমী ছিলেন, ততটাই ছিলেন অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফী, আবার ঠিক ততটাই ছিলেন চুঁচুড়ার দাক্ষায়নী বা গুপ্তিপাড়ার ফুলকুমারী। শিল্পী ধর্ম্মদাস সুর বলতেন যে থিয়েটার মনে করলেই করা যায় না বা অভিনেতাও তড়াক করে হওয়া যায় না। গিরিশ, অমৃত, মতি, মহেন্দ্র ও শিশির কেউই জন্মানর সঙ্গে সঙ্গেই অভিনেতা হয়ে পড়েননি—সকলকেই ঐকান্তিক পরিশ্রমে ধাপে ধাপে উঠতে হয়েছে।

কেউ কি একদিনে একটা ঘা শুকুতে দেখেছে ? তবে কেমন করে আমরা আশা করতে পারি যে আমরা একদিনে একটা মস্ত কিছু হয়ে পড়বো ? শিক্ষানবিশি ছাড়া গতি নেই।

কি করা যাবে

আমরা যদি মনে করি যে আমরা ব্যাঙ্কের চাকরিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে ব্যাঙ্কার হব বা কেরানী হওয়া মাত্রেই ডিরেক্টার হব তো সেটা মনে করাটাও পাপ। কারণ মিথ্যা বলাতেও যেমন পাপ—মিথ্যা ভাবাতেও ঠিক তেমনি পাপ। তিতু বা তিতুর সেনাপতি মাসুম কি এটা প্রমাণ করে দেয়নি যে বাঁশের কেল্লা নিয়ে সেনাপতি হওয়া যেমন যায় না তেমনি যুদ্ধ করাও চলে না। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত—মৃত্যু।

আমরা প্রায়ই বলি—'ইচ্ছা থাকে যার, উপায় হয় তার'। অনেক প্রবাদের মতন এ প্রবাদটা বহুদিন ধরে চলে এলেও এর দাম কমেনি। কেননা সাংসারিক বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হওয়াটায় নিঃসংশয় না হতে পারলেও মনে যদি কাজ করবার প্রকৃত ইচ্ছা থাকে তবে কাজ যত শক্তই হোক না কেন তার একটা না একটা উপায় হবেই। যতক্ষণ শরীর ও মন সুস্থ থাকবে, ততক্ষণ ইচ্ছাও হবে রাস্তা খুঁজে বার করবার, কারণ ইচ্ছার ভারে বোঝা বোধ হতেই পারে না।

কেবল যারা দুর্ব্বল, যারা ভীতু, যারা কুঁড়ে শুধু তাদের কাছেই যত লেঠা যত মুস্কিল এসে জড় হয়—আর তারাই বলে এ পার হওয়া দুষ্কর। পাহাড়ের উপর রেল লাইন পাতা অসম্ভব হলে এঞ্জিনিয়ার কি কাঁদতে বসে যায়? না, পাহাড় ফুটো করে রেল লাইন চালিয়ে দেয়? সে কি করে?

কি করা যাবে

বিচারক জানকীনাথ বলতেন যে অসম্ভব বলে যদি কিছু থেকে থাকে তো সেটা তিনি দু'পা দিয়ে মাড়িয়েই গেছেন—সেটাকে মাথা তুলতে দেননি। মানুষের যদি নিজের উপর বিশ্বাস থাকে আর যদি সে উদ্দেশ্য খাঁটি হয় তো তার খানিকটা সফলতা আসবেই আসবে। সে যদি পৃথিবীর সকলকে নাও সন্তুষ্ট করতে পারে তবু তার নিজের বিবেককে অন্ততঃ সন্তুষ্ট করতে পারবেই।

মানবত্বের ইতিহাস তন্ন তন্ন করলে আমরা দেখতে পাব যে সেখানে শতকগুলো দৃঢ়নিশ্চয় লোকের বার্তাবত্তার বিবরণ বই আর কিছুই নেই। আমাদের জাতের এই যে কৃষ্টি-হিন্দুত্বের এই যে সভ্যতা—এটা শুধু তাঁদের নির্ভীকতায় গড়ে উঠেছে। তাঁদেরই আশা আকাঙ্ক্ষা আজও আমাদের পথ দেখাচ্ছে। তাঁদের উৎসাহ, উদ্দেশ্য ও অধ্যবসায় যা কিছু সবেরই উত্তরাধিকারী এই আমরাই।

কাদা তো দূরের কথা, আমাদের পায়ের তলার মাটিটা আর মাটি নেই—শক্ত লোহার ডেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দরকার এটাকে পিটে চৌরস করে নেওয়ার—নৈলে আমাদের দাঁড়াবার স্থান হবে না। আর এটাও আমরা পারবো শুধু তাঁদেরই শুভেচ্ছায় কেননা তাঁরাই আঘাতের উপর আঘাত দিয়ে এখনও পৃথিবীর নমনীয় ভাবটাকে নষ্ট হতে দেননি।

কি করা যাবে

আমরা ঐ সেদিনও কি গোলাপ গিরিজিকে বলতে শুনিনি—"ভোলা, সাধন করতে এসে গায়ে অত কাপড় জড়ানো কেন? সব বস্ত্র ত্যাগ করে শুধু কোপান নিয়ে বেরিয়ে যা—তোর মত আরামপ্রিয় শিষ্যে আমার প্রয়োজন নেই। স্তম্ভিত ভোলানন্দ কি করে ছিলেন? সাধনা ত্যাগ করে ছিলেন? না, তাঁর বাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ছিলেন? তিনি কি তৎক্ষণাৎ কৌপীন মাত্র সম্বল করে আশ্রমের বাইরে গিয়ে দাঁড়াননি? প্রহরের পর প্রহর সেই দারুণ পৌষ মাসের ঠাণ্ডায় উলঙ্গ অবস্থায় তিনি কি মৃত্যুকে সামনে দেখতে পেয়েও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তিনিই যে সেই ভবিষ্যৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজ তা কি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেননি?

যে দিন শ্রীবাস পণ্ডিতের একমাত্র ছেলের মৃত্যু হয় সে দিন শ্রীবাসের বাড়ীতে কি মহাপ্রভুর কীর্তন বন্ধ ছিল? শ্রীবাস কি সে কীর্ত্তনে যোগ দেননি? বাড়ীর মেয়েরা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেও তিনি কি ছুটে গিয়ে বলেননি—"তোমরা এ কী করছ? দেখতে পাচ্ছনা কি, স্বয়ং মহাপ্রভু আমার উঠনে এসে নৃত্য করছেন আর তাঁরই সামনে এই শিশুর মৃত্যু—এ মৃত্যু আমাদের কত সৌভাগ্যের? এতেও যদি তোমরা চিৎকার করে কীর্ত্তনে বাধা সৃষ্টি করো—ঠিক জেনো, আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরবো"। কে না জানে এর পরই শ্রীবাসের দেব-দুর্লভ পুরস্কার লাভ হয়—গৌর নিতাইকে তিনি পুত্ররূপেই পান।

কি করা যাবে

'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'সামাজিক প্রবন্ধ' বই দু'খানির লেখক নিশ্চয়ই তাঁর এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টিকে তাঁর অবিরত পরিশ্রম ও প্রযত্নের ফল বলেই নির্দেশ করে থাকবেন; কিন্তু তাই বলে আমরা কোন মতেই 'দাদা ও আমি' নাট্যকখানির রচনাকে চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফল বলতে পারব না—বরং বলবো উপেনদাস যেমন লেখা পড়া না করে বৃথা কাজে সময় নষ্ট করেছেন তেমনি বই ছাপিয়ে ও থিয়েটার করে বৃথা পয়সা নষ্ট করেছেন বৈ আর কিছুই করতে পারেননি।

আমাদের এ কথা তা বলে উমেশ বাঁড়ুজ্জের বেলায় খাটবে না। ছেলে বেলায় তাঁরও লেখা পড়ায় মনোযোগ ছিল না—তখন থিয়েটার করে বেড়াতেন বটে—কিন্তু তাঁর বাপ তাকে এক এটর্নী আপিসে কেরানী করে দেবার পর থেকেই—তার আইন শেখবার ভীষণ ঝোঁক হয়। সেই অনুরাগ উমেশচন্দ্রকে বিলেতে টেনে নিয়ে গিয়ে ব্যারিষ্টার করে শেষে কলকাতায় এনে ব্যবসায় জুড়ে দেয়।

স্যার সুরেন বাঁড়ুজ্জের বিচারের সময় ইনিই কাজ করেন; আবার ইনিই এদেশীয়ের মধ্যে প্রথম ষ্ট্যাণ্ডিং কৌঁসিলী হন। উমেশচন্দ্র দু'বার জাতীয় মহাসভার সভাপতি হন; দু'বার হাইকোর্টের জজের চাকরি প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ জীবনে ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানে 'খিদিরপুর হাউস' নাম দিয়ে বাড়ী তৈরী করে তাতে বসবাস ও প্রিভিকাউন্সিলে ব্যবসা করেন এবং সেই বাড়ীতেই মারা যান।

কি করা যাবে

মহেশপুরের জন্মান্ধ মহেশ কানাকে আমরা আজও ভুলতে পারিনি কেন ? কায়স্থের ঘরে জন্মেও তিনি লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পাননি। বাপেরও অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। কিন্তু ভগবান তাঁকে ললিত কলায় এমনই একটা তীব্র অনুরাগ দিয়ে ছিলেন যার জন্যে কানাও আজ জগতের কাছে চাক্ষুষ হয়ে আছেন। পড়াতেও পারেনি—তা ছাড়া কারুর কাছে প্রথমটা কোন রকম সাহায্যও পাননি—এটা খুবই সত্যি।

কিন্তু এঁদের বাড়ীর কাছেই একটা টোল ছিল—ইনি সব সময়েই সেখানে গিয়ে বসে থাকতেন আর পড়ুয়াদের পড়া শুনতেন। এই রকম শুনে শুনে ইনি অমরকোষ কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। তা ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত ও আরও অনেক রকম পুরাণের মর্ম বেশ করে মনের মধ্যে গেঁথে নেন। এই দুর্দান্ত চেষ্টা বা প্রতিভা দেখে শেষ পর্যন্ত টোলের পণ্ডিতেরাও মহেশকে শেখাতে আরম্ভ করেন এবং দেখতে দেখতে তাঁরও কবিত্বশক্তির বিকাশ আরম্ভ হয়।

এই সময় থেকে মহেশ গান শিখতে শুরু করেন এবং ক্রমে কবিওয়ালা সমাজের সঙ্গে ভিড়ে যান। তখন চারদিক থেকে কবিওয়ালারা এসে তাঁকে আমন্ত্রণ করতে থাকেন এবং তিনি সেই সুযোগে ধনী ও ভদ্র সমাজে পরিচিত হয়ে পড়েন।

কি করা যাবে

ছাতুবাবু ও লাটুবাবু যে একশো আট জন কবিওয়ালাকে প্রতিপালন করতেন মহেশ কানাও তাঁদেরই মধ্যে একজন। এঁদের আশ্রয়ে এসে একাগ্রচিত্তে গানের আলোচনা করার দরুনই আজ বাঙ্গালী তাঁকে চেনে ও জানে।

করাচির মহম্মদ আলি জিন্নার জীবন ব্যাপারটাও যে আমাদের মধ্যে আরও বেশী উৎসাহের সঞ্চার করবে তাতে ভুল নেই। রাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধে তিনি আমাদের বিরুদ্ধবাদী হলেও তাঁর সদ্‌গুণগুলোতে আমাদের অন্ধ সাজা চলে না। এ বিষয়েতেও তো তাঁর হাতে খড়ি হয় দাদাভাই নৌরজীর কাছে এবং আমাদের গোখেলের আদর্শেই তিনি তাঁর মতামত গড়ে তোলেন।

শোনা যায় 'মসলেম গোখলে' বলে লোকে তাঁকে চিনুক—এ আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছেলে বেলায় না কি ছিল। যখন তিনি বোম্বাইএর একজন বড় ব্যারিস্টার তখন তিনি কংগ্রেসেই ছিলেন এবং সেখান থেকে ব্যবস্থাপক সভায় যান। আমাদের যত দূর ধারণা বিয়ের পর থেকেই তিনি বদলাতে আরম্ভ করেন এবং আইন সংক্রান্ত প্রশ্নে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দেন। তাঁর মতন পরিশ্রমী অথচ কিছুতেই দমবার নন এমন লোক আমরা সচরাচর কটা দেখতে পেয়েছি? তিনি যে নির্ভীক উদ্যম নিয়ে এক দিন মসলেম লীগের আইন কানুন সংশোধন করে তাতে যোগ দেন এবং আর এক দিন 'লী' কমিশনের রিপোর্টের তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন—সে উদ্যম ক'জনের মধ্যে আছে?

কি করা যাবে

তাঁর চেষ্টা এতদূর ঐকান্তিক বলতে পারা যায় যে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সেটা সাফল্য লাভ করে শেষ পর্যন্ত পাকিস্থানের দাবীকেও হটাতে পারেনি। তিনি যতই আমাদের বিরুদ্ধাচারী হন না কেন তবু আমরা একথা বলতে ছাড়বো না যে তাঁর মতন রাজনীতিজ্ঞ নেই বললেও চলে।

অধ্যবসায়ের ফলে রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী পাদপূরণে অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করে ছিলেন। কেউ কোন কবিতার একটা অংশমাত্র বললেই তৎক্ষণাৎ তিনি মুখে মুখে কবিতাটি পূর্ণ করে দিতেন। এ বড় সাধারণ চেষ্টার ফল নয়।

একবার একজন ভাদুড়ী মশাইকে পরীক্ষা করবার জন্যে প্রশ্ন করেন,—আচ্ছা, পাদপূরণ করুন তো—'বড় দুঃখে সুখ'। রসসাগর মুখে মুখে জবাব দেন—

"চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চকা বলে চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক।
বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল—বড় দুঃখে সুখ॥"

এর চেয়ে আরও বড় অধ্যবসায়ী ছিলেন ফুলিয়ার মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝা। এখনও কেউ কেউ বলেন কৃত্তিবাস সংস্কৃত জানতেন না, কথকদের শুনে শুনে রামায়ণ রচণা করেছেন।

কি করা যাবে

সংস্কৃত জানুন আর না জানুন সেটা আমাদের আসল প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন হল, কত বড় অধ্যবসায়ের ফলে বাঙ্গালী আজ ঘরে ঘরে রামায়ণের সেই উপাদেয় কাব্য পড়তে পেয়েছে ও পাচ্ছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, যাঁকে মহাত্মা গান্ধী পর্যান্ত তেজস্বী মহাপ্রাণ ও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার বলে বলতেন, তিনিও তাঁর জীবনযাত্রা সুরু করেন দারিদ্রের হীমশীতল ছায়ার কোলেই। বহুবৎসর ধরে এঁর পথ এক রকম কণ্টকাকীর্ণ ও দুরারোহ হয়েই ছিল তবে ইনি আস্তে আস্তে সেই খাড়া পথ ধরেই উঠতে থাকেন প্রাণপণ চেন্টায়।

তাঁর বাপ ভুবন মোহন প্রসিদ্ধ এটর্নী হলেও চল্লিশ হাজার টাকার ঋণের দায়ে ইন্‌সলভেন্সি নিয়ে ছিলেন। সুতরাং সে দিক থেকে কোনও রূপ সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা চিত্তরঞ্জনের ছিল না।

তার উপর সাধারণ বি, এ, পাশ করে ব্যারিস্টার হওয়ায় প্রথম প্রথম পসার প্রতিপত্তি করতে পারেননি বলে তিনি সে সময়টা যত দূর মিতব্যয়ী হওয়া সম্ভব তাই হয়ে ছিলেন।

পরে প্যারিস থেকে কাপড় কাচিয়ে এনে পরলেও সে সময়ে খাওয়া-পরার দিকটায় তিনি বড় মানুষী মোটেই করতেন না। এত অসুবিধার মধ্যেও তিনি ঘাবড়াননি।

কি করা যাবে

তাঁর ধৈর্য্য ভেঙ্গে পড়েনি। উৎসাহ এক বিন্দুও কমেনি বরঞ্চ বিখ্যাত আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় সুপ্রসিদ্ধ অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ নিয়ে তিনি এমন গভীর আইন জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে ছিলেন—যে জজ, জুরি, আইনব্যবসায়ী গায় সাধারণ লোক পর্যান্ত সবাই অবাক হয়েছেন। সে দিন সকালে তিনি আদালতে ঢোকেন একজন নগণ্য ভিখিরী; বেরিয়ে আসেন এক জন সম্ভ্রান্ত ক্রোরপতি। তাঁর সে বক্তৃতার ফলে তিনি আদালত দ্বারের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এটর্নীর ব্রিফে তাঁর হাত ভরে ওঠে।

সেই দিন থেকেই তাঁর ধনাগমও হ'তে সুরু করে। শোনা যায় পৃথিবীর মধ্যে যে ক'জন ব্যারিষ্টার সব চেয়ে বেশী টাকা রোজগার করেছেন দেশবন্ধু তাঁদের মধ্যেই একজন।

এক দিকে ইনি যেমন ভোগও করেছেন অপর দিকে তেমনি ত্যাগও করেছেন। জীবনের যা কিছু উপার্জ্জন এমন কি দেহধারী আত্মাটাকেও জননী জন্মভূমির চরণে উৎসর্গ করে দেশবাসীর কাছ থেকেও ইনি দেশবন্ধু নাম পেয়ে ছিলেন। এঁর শবানুগমনে যে লোক-সমাগম হয়ে ছিল, এক মাত্র গান্ধীজী ছাড়া, এ দেশে কেন পৃথিবীর কোনও দেশেই কখনও কোনও রাজা মহারাজা, সাধু, সন্ন্যাসী, নেতা বা অন্য কারুর মৃত্যুতে সে রূপ হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

তাই কবিও প্রাণের আবেগে লিখে ছিলেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

কাপ্তেন রাজকৃষ্ণ

কর্ম্মকারের নাম আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি। এক দিন তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালীরই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এমন কি গল্পের মতনই লোকের মুখে মুখে ফিরতেন।

আবার ফের তাঁর আদর্শের উল্লেখ হবেই হবে যখন লোকে জানতে চাইবে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় মানুষের পক্ষে কতখানি উন্নতি করা সম্ভব বা সামান্য মিস্ত্রি থেকে কেবল অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির জোরে তিনি কি হয়ে ছিলেন।

সবাই জানে যে তাঁর বাপ সামান্য চাষবাস এবং কোদাল, কুড়ুল গড়েই দিন কাটাতেন সুতরাং রাজকৃষ্ণের অদৃষ্টে স্কুলের শিক্ষালাভ হয়নি। তিনি নানা রকম কল কারখানায় কাজ করে সে সব বিষয়ে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে ছিলেন। জাহাজ মেরামত, রেল-এঞ্জিন-বয়লার মেরামত, সাঁকো তৈরী, কাগজের কলের কাজ, এ সব-কিছুই নিজের চেষ্টায় শিখে শেষে কামান বন্দুকের কাজ শেখবার জন্যে কাশীপুর ও দমদমার গান্ ফাউণ্ডারীতে ঢোকেন সামান্য মিস্ত্রী হয়ে—কিন্তু দেখতে দেখতে সেখানকার হেডমিস্ত্রী হ'ন।

কি করা যাবে

এখানে যখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন ঠিক এমন সময়ে নেপালে কলকারখানা সম্বন্ধে ভাল কারিগরের দরকার হওয়ায় দেড়শো টাকা মাইনেয় তিনি নেপালে চলে যান। তখন চন্দ্রসমসের নেপালের প্রধান মন্ত্রী ও তাঁরই ইচ্ছায় নেপালের টাঁকশালে হাতে-গড়া টাকা-কড়ির প্রচলন বন্ধ হয়। রাজকৃষ্ণই সেখানে গিয়ে প্রথম মেসিন আনিয়ে যন্ত্রযোগে টাকা পয়সা তৈরী করেন।

তারপর কামান বন্দুকের কারখানায় ঢুকে উন্নত ধরনের কলকব্জা এনে নতুন ধরনের কামান বন্দুক তৈরী করতে থাকেন। খাল কেটে ঝরণার জল এনে তারই সাহায্যে কল চালান। সেখানে যখন তিনি এই সব করছেন সেই সময়েই রাজা সুরেন্দ্র বিক্রমের মৃত্যু হয়। রাজা মারা যাবার কিছুদিন বাদেই রাজকৃষ্ণ কাজ ছেড়ে দেশে ফিরে আসেন।

কিন্তু দেশে তিনি বেশী দিন থাকতে পাননি। সঙ্গে সঙ্গেই কাবুলের আমীর তাঁকে ডেকে পাঠান। সুতরাং বারো জন লোক সঙ্গে করে তিনি কাবুল যাত্রা করেন। আমীর নিজে এঁর সঙ্গে দেখা করে যাতে ইনি নির্বিঘ্নে ও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দেন এবং মাইনে দুশো টাকা বন্দোবস্ত হয়। কাবুলে প্রথম কল বসিয়ে কামান বন্দুকের কাজ আরম্ভ করেন এই বাঙ্গালী মিস্ত্রী—রাজকৃষ্ণই। কল চালাবার সময় আমীর স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কি করা যাবে

এই সবগুলোর মধ্যে আর কিছু থাকুক আর না থাকুক একটা যে জাগ্রত ও জলন্ত জীবনের কবিত্বপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ আছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এটা উৎকট কল্পনা-প্রসূত গল্প নয়—এটা পড়বার—বোঝবার—এবং মনে প্রাণে গেঁথে নেবার জিনিস। রাজকৃষ্ণের উৎসাহ, তার সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যে একাগ্রতা ও অধ্যবসায় আমাদের প্রত্যেকের কাছে ধ্যান জ্ঞানের বিষয় বস্তু হলেনা মা লক্ষ্মী কৃপা করবেন। তবেই না আমরা তাঁর মতন কাবুল থেকে অটোমেটিক ঘড়ি, উৎকৃষ্ট গালচে, ঘোড়া এবং ঘোড়ার পিঠে টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারবো।

যে কাজে আনন্দ আছে সেই কাজ করলে তবেই না মানুষ বিদ্বান্ বলে পরিচিত হবে। ক্রমাগত অভ্যাসই না মানুষকে বড় করে। জ্ঞান কি বাইরে থেকে আসে? কখনই নয়; সেটা যে ভেতরের জিনিস—চর্চা করলে তবে না তার বিকাশ হবে। মনে প্রাণে এমনই তার চর্চা করতে হবে যে যা কিছু আমরা করিনা কেন—কাজ আমাদের আনন্দে আত্মহারা করে দেবে। তবে না বুঝবো আমরা কাজ করতে শিখছি।

কাজ কি ভাবে হয় জানলেই কাজ করা হল না। সত্যিকারের শক্তি সেটা দিয়ে কাজ হবে সেটার মধ্যে যে বিদ্যা আছে তাকে আস্তে সেটাকে আয়ত্ত করতে হবে—তার মধ্যে ঢুকতে হবে এমনই নিঃসাড়ে যে—কখন আমরা একাত্মাকার হয়ে গেছি—তা যেন আমরাই টের না পাই।

কি করা যাবে

পেছলাবার পূর্ব্বে যখন হাত বাড়িয়ে কিছু ধরবার দরকার হয়না তখন কাজে লেগে আমরাই বা কেন মনটাকে পেছলাতে দেব? কোনটায় আনন্দ? চলায়, না পেছলানোয়? কি হবে পিছলে হাত পা ভেঙ্গে? তার চেয়ে সত্যকে আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে চলিনা কেন? তাতে আনন্দ ঢের বেশী, ভয়েরও কারণ নেই। বড় বড় ব্যবহারজীবীদের জীবনচরিতের মধ্যে আমরা এমনতর উৎসাহ, অধ্যবসায় ও সততার অনেক কিছু দৃষ্টান্ত দেখতে পাই---যা দেখলে মনে হয় তাঁরা এই জন্যই ব্যবসায়ে কৃতকার্য হয়েছেন। উকিলের ভাল পসার হতেই পারে না যে যদি নাছোড়বন্দা হয়ে ঐকান্তিক ভাবে লেগে না থাকে।

বিচারক জানকীনাথ যখন বাঁকুড়ায় ওকালতি করেন তখন একজন সদ্যোবতীর্ণ উকিল-পুত্রের পসার সম্বন্ধে তাঁর বাপের উৎকণ্ঠার উত্তরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন---"তবে কি আপনার ছেলে আমার মতন সজনে শাক সড়সড়ি দিয়ে ভাত খেতে অভ্যস্ত নন?" সৈয়দ আমীর আলীও যখন হাইকোর্টে আইন ব্যবসা সুরু করেন তখন তাঁকেও প্রেসিডেন্সি কলেজে মহম্মদীয় আইনের অধ্যাপক হয়ে দিন গুজরান করতে হয়। স্যার আবদার রহিম ব্যারিষ্টার হওয়া সত্ত্বেও দেড় বছর পর্যন্ত ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমব্রান্সারের কাজ করেন। পরে ধাপে ধাপে উনিও উঠেন।

কি করা যাবে

ওকালতি পাস করেই যখন পূজ্যপাদ জানকীনাথ হুগলীতে মাত্র ওকালতি আরম্ভ করেছেন এমন সময় তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে একবার দ্বারকা নাথ মিত্র মশায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি তাঁর কাছে জানতে চেয়ে ছিলেন কি করলে ভাল উকিল হওয়া যায়। উত্তরে মনস্বী দ্বারকানাথ বলেন—"এর কোন বাঁধা ধরা নিয়ম আছে বলে তো আমার জানা নেই তবে—এই মাত্র বলতে পারি যে—সন্ন্যাসীদের মতন থাকবে আর ভূতের মতন খাটবে—তাহলেই ভাল উকিল হবে"।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে যার যেমন ব্যবসাই হোক না কেন উন্নতির রাস্তা সকলের পক্ষেই সমান কণ্টকাকীর্ণ। অত বড় ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারী—তিনিও মায়ের হুকুমে নিজের খরচায় তাঁর গুরুর পরিত্যক্ত এক রোগিনীর উপর দুঃসাধ্য অস্ত্র চিকিৎসা করে তবেই ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় অস্ত্র চিকিৎসক বলে খ্যাতি লাভ করে ছিলেন। 'ডাক্তার'-মার্কা, মোটরে চাপার দরুন তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি হয়নি।

অমৃতবাজার গ্রামে জন্মে সেই দু ভাই শিশির ও মতিলাল তখনকার সেই 'অমৃত বাজার পত্রিকা'কে দাঁড় করাবার জন্যে কি কষ্টই না করেছেন। এখনকার 'অমৃত বাজারে'র কথা বলছি না—আমরা বলছি তাঁরা যখন নিজের গ্রামে বসে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক 'অমৃত বাজার' চালাতেন—সেই সময়ের কথা।

কি করা যাবে

কাগজখানা ছাপা হ'ত একটা কাঠের প্রেসে, দু'ভাইই তার সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর ও কম্পোজিটার। তাঁরাই খবর জোগাড় করতেন, প্রবন্ধ লিখতেন, অক্ষর সাজাতেন প্রুফ দেখতেন আবার নিজেরাই স্বহস্তে গ্রাহকদের ঠিকানা লিখে কাগজগুলো সব ডাকঘরে দিয়ে আসতেন। গ্রাহক সংখ্যা তখন মাত্র পাঁচশো। কিন্তু সেই কাগজই শেষে তাদের চেষ্টায় তাঁদের নিষ্ঠায়, তাঁদের দুজনকে সর্বস্বান্ত করেই—সাপ্তাহিক থেকে শ্রেষ্ঠ দৈনিকে দাঁড়িয়ে ছিল যা—এখন সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার যখন এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ছেড়ে হোমিওপ্যাথীর সপক্ষে এসে দাঁড়ান সেই সময় থেকে তাঁকে যে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়ে ছিল তার তুলনা হয় না। কিন্তু তাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হননি বলেই শেষে ডাক্তারদের অগ্রণী হয়ে প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করে ছিলেন। রামধন চাটুজ্জের ছেলে মদন মোহন তর্কালঙ্কার শিক্ষা শেষ করে যখন পনের টাকা মাইনের গভর্ণমেণ্ট পাঠশালায় কাজ করতে ঢোকেন, তখন এই বলেই ঢোকেন যে নারায়ণের উদ্দেশ্য ও তাঁর ইচ্ছা যেন সফল হয়। বহুদিন এই সামান্য মাইনেতেই তিনি কঠোর পরিশ্রম করে তাঁর দেহটাকে ভগবানের কাজেই উৎসর্গ করায় ক্রমশঃ বারাসত স্কুলে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে, কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান পণ্ডিতের কাজ করার পর শেষে মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত হন। এইখানেই শেষ নয়—ভগবানের কৃপায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটও হয়ে ছিলেন।

কি করা যাবে

শৈশবে গোকুলদাস তেজপালের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। বোম্বাই সহরের সামান্য ফেরিওয়ালার ছেলে বলে তাঁর মাত্র আট বছর বয়সেই লেখা পড়া সাঙ্গ হয় এবং সেই থেকেই রোজগারের আশায় ফেরিওয়ালার ছেলে ফেরিওয়ালা হয়েই কিছু দিন কাটান। এগার বছর বয়সে বাপ মারা গেলে তাঁর সঞ্চিত কিছু টাকা পেয়ে সেই সময় থেকে তিনি ব্যবসা করতে আরম্ভ করেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর টাকা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখা-পড়ার দিকে আবার মনটা ঝোঁকে কিন্তু তখন তিনি দেখতে পান যে তিনি যাও বা একটু লেখাপড়া শিখে ছিলেন সেটুকুও ভুলে গেছেন। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে যখন ইচ্ছা আর সাহস এক হয় তখন ফের উৎসাহ আসেই।

তাই তিনি রোজ একটু করে বই পড়তেন আর মনে মনে ভাবতেন—"ছি ছি! আমি এটাও জানতুম না"! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন দুবেলা রান্না করার দরুন রীতিমত পড়ার সময় পেতেন না—রান্নার সময়ও বই কাছে রেখে দিতেন—এবং একটু অবসর পেলেই পড়ে নিতেন—গোকুলদাসও অনেকটা সেই রকম করতেন। ব্যবসায় মেতে থাকার দরুন খাওয়ার ফাঁকে তিনি যতটুকু পারতেন বইএর পাতা ওল্টাতেন।

এ দিকে গুপ্তিপাড়ার ভোলা ময়রারও চেষ্টা বড় কম ছিল না।

ছেলে বেলায় সামান্য লেখা পড়া শিখলেও নিজের ও পরের উপকারের তাগিদে পারসী, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষা এমন কি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রও বেশ কিছুটা শিখে ফেলে ছিলেন। তিনি বাগবাজারে থাকতেন বটে, সেখানে তাঁর মিষ্টির দোকানও ছিল সত্য— তবে কেবল যে ভোলা ময়রাই সেখানে থাকতো তা নয়—সুরসিক ভোলা কবিও সেখানে থাকতেন।

তখনকার সমাজের ত্রুটি লক্ষ্য করে তিনি এমন সব শ্লেষপূর্ণ গান বাঁধতেন যার জন্যে বিদ্যাসাগর মশাই পর্য্যন্ত বলে ছিলেন—"বাঙ্গলা দেশের সমাজকে সজীব রাখতে হলে ভোলা-ময়রার মতন কবিওয়ালার খুবই দরকার"। ভোলার মতন নির্ভীক অথচ স্পষ্টবাদী লোক দেখা যায় না। কেলেগোপালায়নাকে যে তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না তা তাঁর নিজের কথাতেই সব চেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে—যখনই তিনি যজ্ঞেশ্বর দাসকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

"আমি সে ভোলানাথ নই
আমি সে ভোলানাথ নই
আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা
বাগবাজারে রই।।"

খাঁটি বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন বৃত্তান্তও বড় কম শিক্ষণীয় নয়। ছেলেবেলায় ইনি বড় দুরন্ত ছিলেন—লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ দিতেন না—গ্রামের পাঠশালায় মাত্র যা একটু শিখে ছিলেন।

কিন্তু এঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল। একবার যা শুনতেন তা আর ভুলতেন না। বাপ হরিনারায়ণের ইচ্ছা যে তিনি লেখা পড়া শিখে বৈদ্যর ছেলে ভাল চিকিৎসক হ'ন কিন্তু ঈশ্বরের ধনুক-ভাঙ্গা পণ তিনি কবি হবেনই। হরিনারায়ণ একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন—"কবি হওয়ার কি অসুবিধা জানিস্? হয় রাজা—নয় ফকির।" ঈশ্বরগুপ্ত তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"তুমি দেখও, আমি রাজাই হ'ব"।

সেদিন থেকে হরিনারায়ণ অত্যন্ত মনোকষ্টে ঈশ্বরকে তার অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দেন। ঈশ্বরও মামার বাড়ী চলে গিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষায় প্রাণপাত করতে থাকেন। বাইশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি যত্ন ও পরিশ্রমে তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' কাগজের মারফত তাঁর প্রতিভা সারা বাংলায় ছড়িয়ে ফেলেন। বাঙ্গালা কবির মধ্যে একমাত্র তিনিই কেবল লেখার ওপর নির্ভর করে জীবন যাত্রা চালিয়ে—এক দিকে যেমন অর্থোপার্জ্জন অন্য দিকে তেমনি তার সদ্ব্যয়ও করে গেছেন। ইংরেজী লেখা পড়া না করেও তখনকার সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি বড় কম ছিল না। মহাকবি না হলেও তিনি যে একজন মস্তবড় স্বভাব কবি ছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

নিঃসম্বল অবস্থা থেকে বইএর ব্যবসা করে, শুধু অধ্যবসায়, উৎসাহ আর সহিষ্ণুতার গুণে যিনি মৃত্যুকালে তিন লাখ টাকার সম্পত্তি রেখে যান, তিনিই আমাদের শরৎকুমার লাহিড়ী।

কি করা যাবে

মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর ছেলে বলেই তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করে প্রচুর টাকার অধিকারী হয়েও দেশের কল্যাণে বিশ্ববিদ্যালয়কে একখানি বইয়ের সত্ব দান করে ছিলেন। তাঁর দিকে চাইলেই কি আমরা দেখতে পাই না যে শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তাঁর লেখা পড়া হ'ল না। তিনি বাপের সঙ্গে কলকাতায় এসে তাঁদের আর্থিক কষ্ট ঘোচাতে রোজগার করতে লাগলেন। অবশেষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৃপায় তাঁরই মেট্রপলিটন কলেজে একটা ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি পেলেন বটে—কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। অথচ শরীর আরও খারাপ হতে লাগল।

তখন ব্যস্ত হয়ে তিনি ফের বিদ্যাসাগর মশাইয়ের শরণাপন্ন হলেন এবং মনস্থ করলেন তাঁরই সাহায্যে বইয়ের ব্যবসা করে বাপ মায়ের কষ্টের লাঘব করবেন।

শরৎকুমারের মা কিছুদিন আগে দুশো টাকা একজনকে ধার দিয়ে ছিলেন। সেই টাকা এখন ফেরত পেয়ে তিনি ছেলের হাতে দেন। সেটাই হ'ল তাঁর মূলধন—আর বিদ্যাসাগর মশাই সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী থেকে ধারে একশো টাকার বই দেন এই নিয়ে ব্যবসা সুরু হয়। আর এই সময় যে দু'জন লোক তাঁকে সাহায্য করেছিল তাঁরা হলেন, লালচরণ ঘোষ ও স্যার সুরেন্দ্রনাথ।

কি করা যাবে

এ সব লোকের আওতায় পড়ে শরৎকুমারের মন ক্রমশঃ ভয়শূন্য হতে লাগল এবং বাণিজ্যের উৎকর্ষের চেয়ে যেন তিনি জীর্ণ সংস্কারের দিকে চলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল বাংলা দেশের বই এর ব্যবসাকে পবিত্র করে তোলা। তাই বইয়ের ব্যবসার আলোচনাকালীন তিনি খরিদদারকেও বলতেন—"আমি বই এর ব্যবসা করে এইটুকু বুঝেছি যে এ কারবার চালানতে বিশেষ কিছু বাহাদুরী নেই। কেবল টাকা রোজগারই যদি এর লক্ষ্য হয়—এতে গৌরবের কি আছে? সে তো পূজারী বামুন থেকে আরম্ভ করে মেথর পর্যন্ত করছে। কে কার চেয়ে কম"?

সেই জন্যেই তিনি চাইতেন এমন বই বিক্রেতা বা প্রকাশক—যারা ছলাং করে ক্ষুধার্তে ঘাস বা খড় কুচিয়ে দেবে না—জাতের সত্যিকারের খোরাক যোগাবে। বাংলা আর বাঙ্গালা দুইই আজ বইএর নরকে যে দুর্গতি ভোগ করছে—সেটা রোধ করতে হলে নিজেরা মার্জিত রুচি হয়ে দেশের ও দশের রুচি ফিরিয়ে আনতে হবে। লোভ ছাড়তে হবে। আর সুনামের জন্যে টাকার মায়া ত্যাগ করতেই হবে। নইলে আমাদের সঙ্গে আমাদের জাতের মৃত্যুও অবধারিত।

শরৎকুমার অপরের এঁটো কাঁটা নিয়ে কাউকে পরিবেশন করেননি বলেই কোন দিন তাঁকে কারুর কাছে বই এর জন্যে হাত পাততে হয়নি।

তিনি বরং যে সব বই প্রকাশ করতে পেরে ছিলেন—বইএর ব্যবসার যে রকম উন্নতি দাড় করিয়ে ছিলেন- তা তাঁর বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বাবদ কাঁটা-চামচ-হীন খাদ্য বিলানোর মধ্যেই বাঙালী ভোক্তবা আস্বাদ পায়।

মানুষের জ্ঞান-পিপাসাও ঠিক অর্থ-পিপাসার মতনই তার সুপ্ত শক্তিকে দুর্দান্ত পরিশ্রম করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। তাই পূজ্যপাদ বিচারক জানকীনাথও একদিন বলে ছিলেন—"আমি জানি নিধনের ঘরে জন্মানোর কি কষ্ট—কেননা আমিও দরিদ্রের ঘরে জন্মাই। ছেঁড়া কাঁথার একদিকে আমি শুতুম—আর এক দিকে শুতো আমি ও আমার ভাই বোনের একমাত্র সঙ্গী অভাব। যে মায়ের, সন্তানকে খেতে দেবার মতন কিছুই নেই- সে মায়ের কাছ থেকে খেতে চাওয়া যে কত বড় মর্মঘাতী ব্যাপার—তা আমি খুব ভাল করেই জানি"।

"কিন্তু আমার জ্ঞান-পিপাসা আমার খিদে তেষ্টা ভুলিয়ে আমায় দশ বছর বয়স থেকেই লোকের দোরে দোরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। যে আমায় দু'খানি বই একটু পড়তে দিয়েছে—আমি পড়তে পড়তে সারারাত তারই বাড়ীতে কাটিয়ে দিয়েছি—জানি না এমন কত রাতই আমার অনাহারে গেছে। কিন্তু এক রাত্রিও আমার অনধ্যায়ে যায়নি এটা আমি জোর করে বলতে পারি"। আমরাও তাই বলি যে জ্ঞানলিপ্সাই একমাত্র শক্তি যা আমাদের যে কোনও অবস্থাকেই জয় করতে পারে। এর পিপাসা সাধারণ পিপাসাকেও পাত্তি দেয় না।

কি করা যাবে

জ্ঞানার্থীর এই যে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা এটা আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে না পারলেও—এটা যে দুর্জ্জয় চেষ্টা ও দৃঢ় পরিশ্রমেই একমাত্র সম্ভব—সে কথা তার তৃষ্ণাই বলে দেয়। আমরা সামান্য তুচ্ছ জিনিস শেখার জন্যে কত লোককে কত পরিশ্রম করতেই না দেখি—কত লোককে কত গালাগালি খেতেই না শুনি! কিন্তু কেন? স্বেচ্ছায় এ গালাগালি তারা খায় কেন, এ কথা কি কোনও দিনও ভাবি? কেনই বা একজন বছরের পর বছর ছড়ি টানছে; একজন গলা সাধছে; একজন ঠেকা দিচ্ছে? এরা কি সবাই ওস্তাদ হবে?

কেনই বা না হবে? সঙ্গীত-বিশারদ ধীরেন ভটচার্জির ছাত্রী সুষমা কি তার সঙ্গীত লহরীতে সারা ভারতবর্ষের ওস্তাদকুল ও শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করে শেষ পর্যন্ত সঙ্গীত-মুগ্ধা কেশরীবাঈকেও তাঁর গলার হার খুলিয়ে সুষমার গলায় পরিয়ে দিতে প্রবুদ্ধা করেনি?

তার ওস্তাদজীকে জিজ্ঞাসা করলে কি জানা যায় না যে কত অল্প বয়স থেকেই একাগ্র হয়ে এই গান বাজনার চর্চ্চা হয়তো অহোরাত্র করার ফলে সেদিন গুরুর মুখোজ্জ্বল করার মত সঙ্গীত তরঙ্গ তুলতে পেরে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছলো। হয় তো তার গুরুজীর কাছে আমরা শুনবো যে খাবার আর শোবার সময়টুকু ছাড়া সে একটানা সাধনাই করে গেছে বাকী সব সময়টাই।

কি করা যাবে

আমরা যদিও বুঝি যে আমরা সবাই তানসেন কিম্বা মীরাবাই হতে পারি না কিন্তু আকবরের মতন আমাদের অলক্ষিতে গান শুনে বিহ্বল হবার ইচ্ছাটাও তো হতে পারে। এই ইচ্ছাই কি শেষে শিল্পী ও আমাদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব এনে শিল্পীকে উৎকর্ষ সাধনে আরও সচেষ্ট করে না?

এই রকম অধ্যবসায়, এই রকম ধৈর্য, দেখতে পাওয়া যেত নবদ্বীপের যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ছেলে জগন্নাথ তর্কালঙ্কারের ভেতর। ছেলে বেলা থেকে যাকে বলে দারুণ দুর্দান্ত—তিনি তাই ছিলেন। তার ওপর শৈশবে পিতৃহীন হয়ে সেটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছলো। একে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, তাতে মাথার ওপর কেউ না থাকায়, সমস্ত দিন গাছে উঠে পাখীর ছানা ধরে বেড়ানই তার কাজ হয়েছিল। পড়া শুনার ধারও ধারতেন না। একদিন পাখীর ছানা ধরতে এক তালগাছে উঠে পাখীর বাসার মধ্যে হাত ঢুকিয়েছেন এমন সময় এক প্রকাণ্ড সাপ ফণা তুলে তাঁকে কামড়াতে উদ্যত হয়। হঠাৎ এই বিপদে পড়ে ঘাবড়ে না গিয়ে তিনি বজ্রমুষ্টিতে সাপের মুণ্ডটা চেপে ধরেন এবং সাপ যদিও তাঁর হাত জড়িয়ে ধরে তবুও তিনি তৎক্ষণাৎ ধারাল তালপাতার গায়ে ঘসে সাপের মাথাটা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেন।

একজন সন্ন্যাসী তাঁর এই অসমসাহসিকতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখে তাঁকে অনেক সদুপদেশ দেন এবং উপযাচক হয়ে তাঁকে লেখা পড়া শেখাতে আরম্ভ করেন।

এই সন্ন্যাসীর কাছে যখন জগদীশের পড়া সুরু হল তখন তাঁর বয়স আঠার—অথচ তখনও পর্যন্ত অক্ষর পরিচয় অবধি হয়নি। তিনি অসম্ভব পরিশ্রমে দিনরাত পড়ে খুব অল্প দিনের মধ্যেই ব্যাকরণ, কাব্য ইত্যাদির পাঠ শেষ করে ফেললেন।

এ সময়ে আবার এঁর দুঃখের সীমা ছিল না। তেলের অভাবে রাত্রিতে রীতিমত পড়া হত না বলে বাঁশের পাতা জ্বেলে তার আলোয় পড়তেন। এমনি করে জগদীশ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের কাছ থেকে ন্যায়শাস্ত্র পড়ে নিজের অসাধারণ চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যে তর্কালঙ্কার উপাধি পান।

তারপর নবদ্বীপে টোল খোলার ইচ্ছা করেও পয়সার অভাবে টোল খুলতে পারেননি। শেষে গ্রামের লোকেরা মিলে যখন তাঁর জন্যে চতুষ্পাঠী খুলে দেয় তখন দূরদূরান্তর থেকে বহু ছাত্র আসার ফলে তাঁর যশ দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। দীধিতির টীকা রচনা করে ইনি ন্যায়জগতে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন।

তখনকার দিনে দু'বেলা দু'মুটো ভাত এত দুর্মূল্য ছিল না বলেই জগদীশের পক্ষে আঠার বছর বয়সে কাজে প্রবৃত্ত হয়ে উন্নতি করা সম্ভবপর হলেও এখনকার মত কি করা যাবে এই চিন্তাতে পাগল হয়ে রাশিয়া বা আমেরিকার দরজায় ভিক্ষাপাত্র হাতে করে অতি শৈশব থেকেই ছুটোছুটি করেও কি আমাদের পেট ভরবে ?

কি করা যাবে

রাশিয়ার বা আমেরিকার সাংসারিক বুদ্ধি কি আমাদের কর্ত্তব্য কাজের নির্দ্দেশ দিতে পারবে? আমরা মানলুম যে বাপ হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্য আমাদের সন্তানকে লালন পালন করা, শিক্ষা দেওয়া—উকীল হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্য মক্কেল দোষী জেনেও তার পক্ষ সমর্থন করা, তাকে খালাস করে আনা—সৈনিক হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্য হুকুম মুতাবিক গুলি চালানো—তাতে দেশবাসী মরুক আর আত্মীয় স্বজনই মরুক—আবার বিচারক হিসাবে দোষীকে জেলে দেওয়া—হত্যাকারীকে ফাঁসীতে লটকানো।

আমরা আরও মানলুম যতক্ষণ কাজের খাতিরে কি করা যাবে এই প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয় ততক্ষণই না হয় আমাদের কর্ত্তব্যও স্পষ্ট; অন্য কোন কথাই আর ওঠে না। কিন্তু আমাদের যদি কি-করা-যাবের গায়ে 'একি-করা-যাবে' এসে আচম্বিতে এবং সজোরে ধাক্কা মারে—যদি আমাদের ভেতরের মানুষটি হঠাৎ বলে ওঠে—না, আমরা কোনও অবস্থাতেই অসত্যের সমর্থন করবো না—প্রাণদণ্ড দোব না কারণ সেটাও পাপ—নরহত্যা করবো না, কেননা আমরা মানুষের মাংস খাইনা—তখন আমরা কি করবো?

সবাই যা করবে আমাদেরও তাই করতে হবে এমন কি কোনও কথা আছে? আমরা কি এমন লেখা পড়া করে জন্মেছি যে মানুষের মাংস খেতেই হবে?

কি করা যাবে

আমাদের ভেতরের ধর্ম্মজ্ঞান যদি আমাদের বলে—আমরা উপবাসী থাকবো তবুও নরমাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবো না—তখন আমাদের কর্ত্তব্য কি হবে? 'কি করা যাবে' বা 'একি করা যাবে' এ দুটোকে ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে হবে না কি? হিন্দু ছাড়া আর কোনও জাতের সাধ্য নেই আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারে।

তাই আমরা চাই না কারুর দরজায় ধর্ণা দিতে। কারুর সাংসারিক কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে আমাদের কাজ নেই—কারুর ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে আমাদের প্রয়োজন নেই। সকলের সব ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়ে আসলে যা করা যাবে তারই চেষ্টায়—আঠার বছর বয়স হলেও—ঠিক যথাযথ ভাবে আমরা সমস্ত মুনি ঋষিদের—আমরা যেখানে যত ঐশ্বরীয় জীবনের সন্ধান পাব—কেবল তাদেরই মনে প্রাণে অনুসরণ করবো।

কি করা যাবে নয়—যা কিছু সবই করা যাবে—মানুষ যা কিছু করতে পারে আমাদের সবই করতে হবে—তবে যথাকালে, যথাশক্তি আর যথাযথ ভাবে; অথচ ধারণা রাখতে হবে—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ" ॥

আমাদের দেরী করলে চলবে না। উৎসাহ ও ধৈর্যের সঙ্গে সময়নিষ্ঠ হয়ে চলতে পারলে তবে না উন্নতি—তবেই না লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব।

কি করা যাবে

যার কাছে সময়ের দাম নেই—তার কাছে কথার কি দাম আছে? আমাদের কাউকে কথা দেওয়া মানে কি সময় দেওয়াও নয়? যদি আমরা কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারি তো সে কথার মূল্যই বা কি? কারবারির কাছে তো সময়ের খেলাপ খুবই জঘণ্য পাপ—তা করলে তো কেউ আর তাকে বিশ্বাস করবে না, উলটে সন্দেহের চোখে দেখবে।

আমরা কেমন করে ভাবতে পারি যে যিনি ন'টায় দেখা করতে বলেছেন, তার কাছে দশ মিনিট পরে গেলেও দেখা হবে? তিনি থাকবেনই? কে বললে তিনি থাকবেন? কি করে আমরা সেটা জানতে পারছি? তাঁর কি আর কোনও কাজ নেই? আর কাউকে নিয়ে তিনি তো সে সময়টা ব্যস্ত থাকতে পারেন? আমাদের নিয়েই যদি সে সময়টা তাঁকে ব্যাপৃত থাকতে হয়—আমাদের সুবিধা মতন যদি তাঁকে চলতে হয়—তা হলে তো তাঁর অনিষ্ট না হয়ে পারে না।

যাঁরা জীবনে উন্নতি করেছেন তাঁরা যে কেবল বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী তা নয়—তাঁরা পুরো মাত্রায় সময়েরও উপাসক। সময়ের গতিকে অবলম্বন করে তাঁরা চলেন। বিচারক জানকীনাথ তখন ডায়মণ্ডহারবারের মুনসেফ; নির্দ্দিষ্ট সময়ে আদালতে উপস্থিত হয়ে দেখেন তাঁর পেশকার তখনও অনুপস্থিত।

পেশকার এসে যখন তাঁকে জানালেন যে ঘড়ির দোষে আদালতে পৌঁছাতে তাঁর বিলম্ব হয়ে গেছে তখন জানকীনাথ এই বলে তাঁকে তিরস্কার করেন যে হয় তিনি ঘড়ি পালটান —নইলে বাধ্য হয়ে তাঁকে পেশকার পালটাতে হবে।

যাঁরাই বিচার করেন তাঁদের সকলেরই এই অবস্থা। তাঁরা জানেন কোন সময়ে কি করা প্রয়োজন—নইলে সময়ের এদিক ওদিকে হয় তো একটা তুমুল অনর্থ ঘটতে পারে।

মহারাণী স্বর্ণময়ী যদি স্বামীর আত্মহত্যার পর সেই ঘোর দুর্দ্দিনে ঠিক সময় মত সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা রাজীব লোচন রায়কে পরামর্শদাতা হিসাবে না নিতেন, তা হলে কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে জমিদারি ফেরত পাওয়া সম্ভব হত ?

তাই আমরাও যেন শেষ নিশ্বাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সবাইকে ডেকে বলতে পারি—ওরে আয়রে—ওরে ও উৎসাহী—ও উন্নতি-কামী—ওই যে সময় বয়ে যায়—ওরে,

"আয়রে ছুটে, টানতে হবে রসি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি ?
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই করে তুই নেরে কোনো মতে।"

ঃ ঃ ঃ—

—(শেষ)—

১৩৩৬—মাঘ।

নির্ঘণ্ট

--:০:--

অ

অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৪
অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর ৩৭, ৯২
অমৃত লাল বসু ১২৪
অরবিন্দ ঘোষ ১৩৩
অর্জ্জুন (তৃতীয় পাণ্ডব) ১০৯
অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ১৩৫, ১৫২

আ

আকবর (মোগল সম্রাট) ১৪৭
আত্মারাম সরকার ৯৪
আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পণ্ডিত) ৩৪, ৫২
আনন্দমোহন বসু ১৬, ৬৯
আনন্দময়ী দাসী ২৪
আনন্দময়ী দেবী ৬৩
আবদার রহিম (স্যার ১৩৭)
আর্য্যভট্ট (সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ) ১২৩
আলামোহন দাস ৭৩
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (স্যার) ১৫, ৫৫, ৫৮, ৬৬, ৯৬

নির্ঘণ্ট

ইন্দুবালা (গায়িকা) ৪৯, ৫০

ঈ

ঈশান চন্দ্র দত্ত ৭১
ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত (কবি) ১৪১, ১১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (পণ্ডিত) ৯, ১২০ ১৯, ২০, ২২, ৫৮; ৬৩, ৬৫, ৬৮ ৭৩, ৮২, ১০৫, ১৪০, ১৪১, ১৪৫

উদয় শঙ্কর (নৃত্যবিদ) ৩১
উদ্ধারণ দত্ত (ঠাকুর) ১০৭
উপেন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী (ডাক্তার) ৭৫
উপেন্দ্র নাথ দাস ১২৮
উমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২৮
উমেশ চন্দ্র বসু ২৩

ঋ

ঋষি চরক ৮৮, ৯৯
ঋষিবর মুখোপাধ্যায় ১২৩
ঋষি বেদব্যাস ৯২

কবীর ১০১
কালাচাঁদ বল্লভ ১১৬
কালিদাস (সংস্কৃত কবি) ৬৭, ৯৩, ১০৬
কালী দাস চট্টোপাধ্যায় (কালীমির্জ্জা) ৯৩
কালী কুমার দত্ত ১১৮, ১২০
কালী চরণ ঘোষ (জেনারেল) ৮৮
কালী প্রসন্ন সিংহ ৬৮
কুকুব খাঁ ৩৯
কৃত্তিবাস ওঝা (মহাকবি) ১৩১, ১৩২
কালী চরণ ভট্টাচার্য্য ৮৯
কালী চরণ ঘোষ (চৌগাছার) ১৪৩
কৃষ্ণ (বাসুদেব-দেবকীর পুত্র) ৬৮
কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (রসসাগর) ১৩১
কৃষ্ণদাস পাল (রায়বাহাদুর) ৩৪ ৫২
কৃষ্ণপান্তী (রাণাঘাটেরপালচৌধুরী) ৯৭
কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ৯০
কেদার ক্রিশ্চান (অধ্যক্ষ) ১৪০
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (সর্দ্দার) ৯৪
কেশবচন্দ্র সেন ৩৩
কেশরীবাঈ কর্কর (সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী) ১৪৩
কৈলাশচন্দ্র রায় ৩২

নির্ঘণ্ট

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ১৭ ৩১, ৩২

গ

গদাধর (ঠাকুর রামকৃষ্ণ) ১৭, ২৯, ৮০
৬৮, ৭৮
গহরজান (গায়িকা) ৫০
গিরিশ চন্দ্র ঘোষ (সম্পাদক) ৭০
গিরিশ চন্দ্র ঘোষ (অভিনেতা) ৭৮, ১২৪
গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় (স্যার) ১৩, ১৪,
৪১, ৫২, ৫৮, ৬৫
গোকুল দাস তেজপাল ১৪০
গোলাপ সিংরাজ ১২৭
গোবিন্দ কর্মকার (কলচালক) ১০৫
গোবিন্দ চন্দ্র রায় ৮০
গৌরাঙ্গ (চৈতন্য দেব) ৬৮ ১২৭
গৌরদাস বসাক ৮৩
গৌরী শঙ্কর (ওস্তাদ) ৫০
গৌরীসেন ৪৩, ১২০, ১৪১, ১২২
গোপালকৃষ্ণ গোখলে ৫০, ৭৪

চ

চক্রপাণি দত্ত (পণ্ডিত) ৯৯
চন্দ্রমণি ৬১, ৬২,
চন্দ্র সমসের জঙ্গবাহাদুর রাণা ৩৫
চণ্ডীদাস (কবি) ৫৫
চরক (ঋষি) ৮৮, ৯০
চাণক্য (পণ্ডিত) ১০২
চিত্তরঞ্জন দাস (দেশবন্ধু) ১৩২, ১৩৩, ১৩৮
চৈতন্যদেব ৫৮, ১০১, ১০৪

ছাতুবাবু (আশুতোষ দেব) ১৩০

জ

জগদীশ তর্কালঙ্কার ১০৬, ১৪৮
জগদীশ চন্দ্র বসু (স্যার) ৩৬, ৫০
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ১৪৩
জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় (বিচারক) ৩৯,
৫১, ৫২, ৯৮, ৫৯, ৬৬, ১০০, ১০১, ১২৬,
১৩৭, ১৩৮, ১৪৫, ১৫১, ১৫২

জ

জয়দেব (কবি) ৫৫
জহরলাল নেহেরু (পণ্ডিত) ১১
জেনারেল বাবু (জেনারেল কালীচরণ ঘোষ) ৮৮
জাহ্নবী দাসী ৮০
জে, এফ, ম্যাডান, ১১৩, ১১৬, ১১৫
জ্ঞানগোঁসাই (সঙ্গীতবিশারদ জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী) ২৭

ত

তানসেন (প্রসিদ্ধ গায়ক) ১২ ৯৭
তারানাথ তর্কবাচস্পতি (পণ্ডিত) ১০৪
তুতুমিয়া ১২৩
তুলসীদাস (ভক্তসাধু) ৮০

দ

দাক্ষায়ণী দেবী ৫৮, ১২৪
দাদাভাই নৌরজী ৩৮, ৮৫
দাশু (দাশরথি) রায় ৭৩
দীনবন্ধু মিত্র ৬৮
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি) ৭৭
দ্রৌপদী (পঞ্চপাণ্ডব পত্নী)
দ্বারকানাথ ঠাকুর (প্রিন্স) ৭১
দ্বারকানাথ মিত্র ১৩৮
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (নাট্যকার) ৫৩, ৬২

ধ

ধর্মদাস সুর ১২৪
ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (নর্তক) ১১

নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (মৃদঙ্গবাদক) ৮৪
নন্দলাল বসু (শিল্পী) ৩৬
নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ১৭, ১৮, ২০, ২৯, ৬৮, ৯৫, ১০০
নিত্যানন্দ (চৈতন্যসহচর) ৩৮, ১০৭
নিধুরাম গুপ্ত (নিধু বাবু) ৯১, ৯২
নিরঞ্জন দাস ৭৪
নৃসিংহচন্দ্র স্বামী বেণুবাদক ৭১, ৭



নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় (নিগমানন্দস্বামী) ৮০
নরহরি দাস (ঠাকুর) ১০৫
নেতাজী (সুভাষচন্দ্র বোস) ৩, ৬০
৫৫, ৫৬

পঞ্চানন কর্ম্মকার ৪৬
পতিত চন্দ্র সাউ ১১৮,
প্যারীচরণ সরকার (মহাত্মা) ২১, ২২, ৩১
প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (আচার্য্য) ৭৬, ৯০, ২০
প্রসন্নময়ী দেবী ৩২, ৩৩
প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ৫৪

ফ

ফুলকুমারী গুপ্তা ১২৩

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮, ৪৮, ৬১, ৭৩
বরদা প্রসন্ন দে ৩৫
বলরাম (কৃষ্ণের বৈমাত্র ভ্রাতা) ৩৮
বাগ্‌ভট (আয়ুর্ব্বেদী) ৯১
বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১
বামাক্ষ্যাপা ৫৯, ৬০
বালগঙ্গাধর তিলক ৭৩, ৭৪
বাসুদেব সার্ব্বভৌম (নৈয়ায়িক) ৯৩
বিবেকানন্দস্বামী (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) ৩
১৮, ২০, ২৯, ৩৮, ৯৫, ১০০
বুনোরামনাথ (রামনাথতর্কসিদ্ধান্ত) ১০৩
বিহারি লাল সরকার ৭৬
বেদব্যাস (ঋষি) ৯২
বেলা দত্ত (নার্স) ৭৪
বৈকুণ্ঠচরণ শেঠ ১২১
বোপদেব (পণ্ডিত) ৯৩

ভ

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ১৪৮
ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯
ভূদেব মুখোপাধ্যায় (মহাপ্রাণ)
৩৬, ৭০, ৭১, ৯৪

নির্ঘণ্ট

ভারতচন্দ্র রায় ৭৩
ভুবনমোহন দাস (এটর্ণী) ১৩৮
ভোলা ময়রা ১৪০, ১৪১
ভৈরবচন্দ্র বসু ১২১, ১২২
ভোলানন্দ গিরি মহারাজ ১২৭

মতিলাল রায় (যাত্রাওয়ালা) ১২৫
মতিলাল ঘোষ ১৩৮
মতিলাল শীল ১৭
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ৩৮
মদনমোহন দত্ত ১১০, ১১১, ১১২
মনোহর কর্মকার ৪৬
মকবুল আলি মিয়া ১৩০, ১৩১
মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ৭৫
মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মাজী) ১০৭
মহেন্দ্র বিদ্যানিধি ১২৪
মহেন্দ্রলাল সরকার (ডাক্তার) ৩০
মহেশ কাণা ১২৯, ১৩০
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১০, ৫৯, ৬৯
৭০, ৮১, ৮২, ৮৩
মার্কণী সাহেব ৩
মাসুম (সেনাপতি) ১৫
মীরাবাই ১৪৭
মহারাণী স্বর্ণময়ী. ১২

যজ্ঞেশ্বর দাস ১৪৮
যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৩
যুধিষ্ঠির (জ্যেষ্ঠপাণ্ডব) ৯৫
যাদব চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৪৭
যুধিষ্ঠির (ভৃত্য) ৭১, ৭২
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (অধ্যাপক)
৯৪
যোগেশচন্দ্র বসু ৭২, ৭২

রঘুনন্দন (স্মার্ত) ৯৩
রবিবর্মা (চিত্রকর) ৯৭, ৯৮, ৯৯
রামকমল সেন ১১৬
রামকৃষ্ণ (ঠাকুর) ১৭,২৯,৩২,৩৮ ৭৮

নির্ঘণ্ট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বকবি) ৩৭, ৩৮
৪৫, ৫৩, ৭৩, ৭৫,
রমেশ চন্দ্র দত্ত ৫১, ৫২, ৭১, ৭২
রসুলবক্স (গায়ক) ৯২
রাজকৃষ্ণকর্মকার (কামার) ১৩৪, ১৩৫
১৩৬
রাজা রাজবল্লভ ২৪
রাজীব লোচন রায় ১৫২
রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (স্যার) ৮৫
৮৬, ৮৭
রাধানাথ সিকদার ৪৫
রাণী রাসমণি ১১২, ১১৩
রামচন্দ্র(দশরথ-কৌশল্যার পুত্র) ৬৮, ১০০
রামকৃষ্ণ রায় ২০
রামগতি সেন (পণ্ডিত) ২৫
রামগোপাল ঘোষ (বাগ্মী) ১০৬
রামতনু লাহিড়ী ১৪৩
রামদুলাল সরকার ১১০, ১১১, ১১২
রাম চরণ ৫৯
রামধন চট্টোপাধ্যায় ১৩৯
রামপ্রসাদ (সাধক) ২৮
রামমোহন রায় (রাজা) ১৮, ২০, ৭১,
১০১, ১০৩
রামলোচন দত্ত ১১৯
রাসবিহারী ঘোষ (স্যার) ১৭, ১৮, ২০, ৫০
রামানন্দ (ধর্মপ্রচারক) ১০১

লক্ষ্মণ (রামের বৈমাত্র ভ্রাতা) ৬৮, ১০০
লাটুবাবু (প্রমথনাথ দেব) ১৩০
লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) ১২৩
লোচনদাস (ত্রৈলোচন দাস) ১০৫

শচীমাতা ৫৮
শরৎকুমার লাহিড়ী ১৪২, ১৪৩, ১৪১
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৬, ৭৩
শশীচন্দ্র দত্ত ৫১
শার্ঙ্গধর (আয়ুর্বেদী) ৯৯
শিশির কুমার ভাদুড়ী ১২৪
শিশির কুমার ঘোষ ১৩৮
শুভঙ্কর (গণিতজ্ঞ) ৮৮
শ্যামাচরণ বল্লভ ১১৬, ১১৭,
১১৮, ১১৯
শ্রীধর কথক ৮৯
শ্রীবাস পণ্ডিত ১২৭

নির্ঘণ্ট

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কবি) ৭৫
সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড) ১০১
সরোজিনী নাইডু (বাগ্মী) ৫৪
সীতাদেবী (রামের পত্নী) ১০৪
সুধাংশুবালা দেবী ৮০
সুভাষচন্দ্র বোস(নেতাজী) ৯, ৪০, ৫৫ ৫৬
সুরেন্দ্রবিক্রম (রাজা) ১৩৫
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যার) ৭০, ১২৮
সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস(কর্ণেল) ১২, ১১
সুশ্রুত(মুনি) ৯৯
সুষমা দত্ত (গায়িকা) ১৪৩
সৈয়দ আমীর আলি ১৩৭
সোমেশচন্দ্র বসু (ব্রহ্মচারী) ২
সুরেশ চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী ১৩০

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (মহামহোপাধ্যায়) ৬১
হরিনারায়ণ গুপ্ত ১৪২
হরিনাথ দে ১২,১২৬
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭০
হরেকৃষ্ণ দাস ১১২
হরেকৃষ্ণ মুরলীধর সেন ৭৮
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কবি) ৭০, ৭১, ৭৩

— — ॥ ॥ —

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

আনন্দ ভবন,

শ্যামবাবুর ঘাট, চুঁচুড়া

নির্ঘণ্ট

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কবি) ৭৫
সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড) ১০১
সরোজিনী নাইডু (বাগ্মী) ৫৪
সীতাদেবী (রামের পত্নী) ১০৪
সুধাংশুবালা দেবী ৮০
সুভাষচন্দ্র বোস(নেতাজী) ৬, ৪০, ৫৫, ৫৬
সুরেন্দ্রবিক্রম (রাজা) ১৩৫
সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (স্যার) ৭০, ১২৮
সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস(কর্ণেল) ১২, ১১০
সুশ্রুত(মুনি) ৯৯
সুষমা দত্ত (গায়িকা) ১৪০
সৈয়দ আমীর আলি ১৩৭
সোমেশচন্দ্র বসু (ব্রহ্মচারী)
সুরেশ চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী ১৩

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (মহামহোপাধ্যায়) ৬১
হরিনারায়ণ গুপ্ত ১৪২
হরিনাথ দে ১২,১২৩
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭০
হরেকৃষ্ণ দাস ১১২
হরেকৃষ্ণ মুরলীধর সেন ১৩১
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কবি) ৭০, ৫৮
৭১, ৭৩

——:§ ∗ §:——

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
আনন্দ ভবন,
শ্যামবাবুর ঘাট, চুঁচুড়া

১০